হইল। "ষ্টার" থিয়েটারে প্রথমে গিরিশবাবুর দক্ষযজ্ঞ, ধ্রুবচরিত্র ও নলদময়ন্তী অভিনীত হয়। দক্ষযজ্ঞ নাটকে দশমহাবিদ্যার আবির্ভাব এবং নলদময়ন্তীতে কমলকোরক প্রস্ফুটিত হইয়া অপ্সরাগণের প্রকাশ প্রভৃতি কতকগুলি বৈজ্ঞানিক শিল্প রঙ্গমঞ্চে প্রবর্ত্তিত করিয়া গিরিশ বাবু এ সময় রঙ্গালয়ের বিশেষ সৌন্দর্য্য সাধন করিয়াছিলেন।

কিছুদিন পরে গুর্ম্মুখ রায় মহাশয় থিয়েটার ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন। তখন গিরিশ বাবুর সৎপরামর্শ ও সাহায্যে বর্ত্তমান "ষ্টার থিয়েটারের" স্বত্বাধিকারীগণ উক্ত রঙ্গালয়ের স্বত্ব ক্রয় করিয়া লইলেন। অতঃপর যথাক্রমে গিরিশ বাবুর শ্রীবৎস চিন্তা, কমলেকামিনী, বৃষকেতু, চৈতন্যলীলা, নিমাই সন্ন্যাস, প্রহ্লাদচরিত্র, প্রভাসযজ্ঞ, হীরার ফুল, বুদ্ধদেব চরিত, বিল্বমঙ্গল, বেল্লিকবাজার, রূপসনাতন প্রভৃতি নাটকগুলি অভিনীত হইতে লাগিল। এই সকল নাটকের অভিনয় করিয়া "ষ্টার" থিয়েটার বঙ্গবাসীর পরম আদরের হইয়া উঠিল।

গিরিশ বাবু এই সময় নব ছন্দে, নূতন নাটক রচনায় ও নাটক অভিনয়ে স র্ণ নূতন, উন্নত ও মার্জ্জিত প্রণালীর প্রবর্ত্তন করিয়া, সমগ্র বঙ্গবাসীকে চমৎকৃত করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার পৌরাণিক নাটকের জীবন্ত মোহিনী-শক্তিতে শিক্ষিত বাঙ্গালীর প্রাণে হিন্দু-পুরাণের আদর, হিন্দু ধর্ম্মের আদর আবার নূতনভাবে জাগিয়া উঠিয়াছিল।

"ষ্টার" থিয়েটারে যখন চৈতন্যলীলা, নিমাইসন্ন্যাস, বুদ্ধদেব, বিল্বমঙ্গল, রূপসনাতন প্রভৃতি ভক্তিরসমূলক নাটকগুলির অভিনয় হইতেছিল, তখন বঙ্গদেশে এক যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছিল। এই সকল নাটক পাশ্চাত্যশিক্ষাভিমানী নব্যবঙ্গ ও মুণ্ডিতমস্তক তিলকধারী বৈষ্ণবকে একাসনে বসাইয়া কাঁদাইয়াছিল। নাট্যশালাকে এ সময়

বঙ্গবাসী ধর্ম্মশালার চক্ষে দেখিয়া যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। "চৈতন্যলীলার" অভিনয়ে সমগ্র বঙ্গভূমি হরিনামে মাতিয়া উঠিয়াছিল। বঙ্গের ভক্তভূমি নবদ্বীপেও "চৈতন্যলীলার" প্রভাব বিঘোষিত হইয়াছিল।

নবদ্বীপের সুবিখ্যাত পণ্ডিত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয় চৈতন্যলীলার অভিনয় দর্শনের নিমন্ত্রণ-পত্র পাইয়া ও উক্ত নাটকের দেশব্যাপী সুখ্যাতি শুনিয়া তাঁহার পুত্র পণ্ডিত মথুরানাথ পদরত্নকে বলেন,—"হাঁরে থিয়েটারে চৈতন্যলীলা হোচ্চে কি! তবে কি আবার গৌর এলো? একবার কোল্‌কাতা গিয়ে দেখে আয়তো।"

মথুরানাথ কলিকাতায় আসিয়া "চৈতন্যলীলা"র অভিনয় দর্শনে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। অভিনয়ান্তে তিনি উন্মত্তের ন্যায় নাট্যকারের পদধূলি লইতে উদ্যত হইয়াছিলেন! পুনঃপুনঃ বলিয়াছিলেন,—"তোর মনোবাঞ্ছা গৌর পূর্ণ করবেন।"

শুভক্ষণে গিরিশ বাবু "চৈতন্যলীলা" লিখিয়াছিলেন। এ সময়ে তাঁহার ধর্ম্ম-জীবনের মহা পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। যৌবনে গিরিশ বাবুর হিন্দুধর্ম্মে তাদৃশ শ্রদ্ধা না থাকায়, তিনি প্রায়ই আদি ব্রাহ্ম সমাজে উপাসনাদিতে যোগদান করিতেন। একদা আদি ব্রাহ্মসমাজের উৎসবের দিন প্রথমে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পরে বেচারাম বাবু তৎপরে পূর্ব্ববঙ্গদেশীয় জনৈক প্রচারক বক্তৃতা করেন। পরদিবস সুপ্রসিদ্ধ কেশব সেনের বাটীতে আদি ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতাদি সম্বন্ধে আন্দোলন হইতেছিল। কেশব বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"বেচারাম বাবু কেমন বলিলেন?" একজন উত্তর করিলেন, "অতি সুন্দর।" কেশব বাবু পুনরায় পূর্ব্ববঙ্গদেশীয় প্রচারকের উদ্দেশে বলিলেন,—"বাঙ্গালটা কেমন বলিল?" গিরিশ বাবু কেশব বাবুর বাটীতে সেদিন উপস্থিত ছিলেন। তিনি কেশব বাবুর মুখে উপেক্ষার সহিত "বাঙ্গালটা" এরূপ রূঢ়বাক্য

শ্রবণে বড়ই ক্ষুব্ধ হইলেন এবং ভাবিলেন "এই কি ভ্রাতৃভাব!" সে এক ঘোর ধর্ম্ম-বিপ্লবের দিন। সনাতন ধর্ম্মে অনাস্থা,—চতুর্দ্দিকে নব মত উত্থিত। কি সত্য—কি মিথ্যা স্থির করিতে না পারিয়া যুবা গিরিশচন্দ্র নাস্তিক হইয়া উঠেন। সাধু সন্ন্যাসীরা অত্যাচার ভয়ে তাঁহাকে যমের ন্যায় ভয় করিত। গিরিশ বাবু মনে মনে এই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন,—যদি ঈশ্বর থাকেন এবং ধর্ম্ম মানব জীবনের অতি প্রয়োজনীয় বস্তু হয়, তাহা হইলে জীবনধারণের অতি আবশ্যকীয় জল, বায়ু ও আলোক যেমন যথেষ্ট রহিয়াছে, ধর্ম্ম তদপেক্ষা সুলভলভ্য হইত। ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং" হইয়া থাকিত না। কিন্তু নাস্তিক অবস্থাতেও পিতৃদেবের উপর অচল ভক্তিবশতঃ তিনি গঙ্গাস্নান করিতেন, স্বর্গীয় পিতার উদ্দেশে "রাম তর্পণের" মন্ত্রপাঠে, তিন অঞ্জলি করিয়া জল প্রদান করিতেন। ভাবিতেন—"জল দি, কি জানি সত্যই যদি পিতার কোন কার্য্য হয়।" যথাসময়ে সাধক রামকৃষ্ণ ষ্টার থিয়েটারে "চৈতন্য লীলার" অভিনয় দেখিতে আসিয়া গিরিশ-চন্দ্রকে পদাশ্রয় দিলেন। গিরিশ বাবু বুঝিলেন, সত্যই ধর্ম্ম অতি সুলভ, নচেৎ ধর্ম্ম লইয়া থিয়েটারে তাঁহার নিমিত্ত কে উপস্থিত হইবে? রামকৃষ্ণ তাঁহার অন্তরের সকল সন্দেহ মোচন করিয়া দিয়াছিলেন। আজ গিরিশ বাবু একজন পরম ধার্ম্মিক, আজ হিন্দু দেব-দেবীর নুড়িটী পর্য্যন্ত তাঁহার চক্ষে প্রত্যক্ষ দেবতাস্বরূপ। রামকৃষ্ণ বলিয়া-ছিলেন, "গিরিশের বুদ্ধি পাঁচসিকে পাঁচ আনা—তার বিশ্বাস আঁকড়ে পাওয়া যায় না।"

"চৈতন্যলীলা" অভিনয়ের পর হইতেই সাধারণে গিরিশ বাবুকে ভক্তির চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। তৎপরে নিমাইসন্ন্যাস, বুদ্ধদেব ও বিল্বমঙ্গলের অভিনয় দর্শনে, সে ভক্তি আরও দৃঢ় হয়। "নিমাইসন্ন্যাস-অভিনয় দর্শনে রামকৃষ্ণ গিরিশ বাবুকে উন্মত্তভাবে আলিঙ্গন করিয়া-

ছিলেন। "বুদ্ধদেবচরিত" অভিনয় দেখিয়া, স্যার এড্‌উইন আরনেল্ড বঙ্গ নাট্যশিল্পের উন্নতিকল্পে গিরিশ বাবুর যত্ন উদ্যম ও অভিজ্ঞতার যথেষ্ট গুণকীর্ত্তন করেন। এমন কি তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্তের একস্থানে লিখিত আছে,—"যদিচ বাঙ্গালা রঙ্গভূমির দৃশ্যপটাদি দেখিয়া, বিলাতী থিয়েটারের অধ্যক্ষেরা হাস্য করিবেন, কিন্তু গভীর ভাবাপন্ন নাটকাভিনয় ও অভিনয়চাতুর্য্য দেখিয়া নিশ্চয় চমৎকৃত হইবেন।" বুদ্ধদেব অভিনয় দর্শনে, সুপ্রসিদ্ধ জমীদার স্বর্গীয় রায় নন্দলাল বসু বাহাদুর মহাশয়ের জীবহিংসায় এতদূর বিরাগ জন্মিয়াছিল যে, সেই বৎসর হইতে তাঁহার বাটীতে ৺পূজায় বলি বন্ধ করিয়া দেন। বিল্বমঙ্গল পাঠে বিশ্ববিখ্যাত বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন,—"আমি এরূপ উচ্চভাবের গ্রন্থ কখনও পড়ি নাই।" ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর জেনেরালপত্নী লেডী ডাফরিনের ভারতীয় পুস্তকেও গিরিশ বাবুর কর্ত্তৃত্বাধীন থিয়েটার প্রশংসার সহিত উল্লিখিত আছে। সমাজকে লক্ষ্য করিয়া গিরিশ বাবু প্রথমে "বেল্লিকবাজার" প্রহসন রচনা করেন। ইহাতে যথেষ্ট শিক্ষা এবং শ্লেষ থাকিলেও ব্যক্তিগত বিদ্রূপ নাই। কোনও ব্যক্তিবিশেষকে লক্ষ্য করিয়া শ্লেষ তাঁহার রুচিবিরুদ্ধ ছিল। তাঁহার রচিত কোনও সামাজিক নক্সা সে দোষে-দূষিত নয়। বেল্লিক বাজারে তিনি যে একটী নূতন ধরণের পঞ্চরং এর সৃষ্টি করেন, সেই অনুকরণে আধুনিক নক্সাসমূহ রঙ্গালয়সমূহে রচিত হইতেছে।

এমারেল্ড থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা ও গিরিশ বাবুর অধ্যক্ষতা।

অতঃপর কলিকাতার স্বনামখ্যাত ধনকুবের কলুটোলার সুপ্রসিদ্ধ শীলবংশধর ৺গোপাললাল শীল উক্ত নাট্যশালা—যে বাটীতে ষ্টার থিয়েটার সম্প্রদায় অভিনয় করিয়াছিলেন—ক্রয় করিয়া নব সম্প্রদায় গঠনে "এমারল্ড" থিয়েটার নাম দিয়া অভিনয় চালাইতে লাগিলেন।

এদিকে গিরিশ বাবুর নেতৃত্বাধীনে "ষ্টার" সম্প্রদায় নূতন নাট্যশালা

নির্ম্মাণের জন্ত হাতীবাগানে জমী ক্রয় করিলেন। রঙ্গালয় নির্ম্মিত হইতেছে, এমন সময় গোপাললাল শীল গিরিশ বাবুকে তাঁহার থিয়েটারের ম্যানেজার হইবার জন্ত অনুরোধ করিলেন। এই প্রস্তাবে গিরিশ বাবু ভাবিলেন,—গোপাল বাবু 'বোনাস' স্বরূপ তাঁহাকে কুড়ি হাজার টাকা দিতে চাহিতেছেন—সেই অর্থ তাঁহার ষ্টার থিয়েটারের প্রিয়শিষ্যদের অর্থাভাব ঘুচিয়া, নির্ব্বিঘ্নে রঙ্গালয় প্রস্তুত হইবে। তাঁহার শিক্ষাতে তাহারা কার্য্যক্ষম হইয়াছে—কার্য্য চালাতেও পারিবে। কিন্তু না যাইলেও গোপাল বাবুর কোপে পড়িতে হয়। গোপালবাবু পরম্পরায় প্রকাশ করিতেছিলেন যে, গিরিশ বাবু ২০ হাজার টাকা লইয়া, এমারেল্ড থিয়েটারের ম্যানেজার হন ভাল—নচেৎ তিনি ঐ ২০ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া, ষ্টার থিয়েটারের সমস্ত অভিনেতা ও অভিনেত্রী ভাঙ্গাইয়া লইবেন। এইরূপ সঙ্কটে পড়িয়া গিরিশ বাবু, গোপাল বাবুর নিকট ২০ হাজার টাকা বোনাস ও ৩৫০৲ টাকা মাসিক বেতনে থিয়েটারে প্রবেশ করিলেন। শিষ্যবৎসল গিরিশ-বাবু উক্ত কুড়ি হাজার টাকা হইতে ১৬ হাজার টাকা শিষ্যদের নিঃস্বার্থভাবে দান করিয়া, রঙ্গালয় নির্ম্মাণের ব্যয়সঙ্কুলান করেন; এবং স্বত্বাধিকারিগণকে বিশেষ অনুরোধ করিয়া বলেন,—"তোমরা ভদ্রসন্তান, নানা প্রো প্রাইটার কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হইয়া, এক্ষণে ঈশ্বরের ইচ্ছায় স্বাধীন হইলে। আমার অনুরোধ, যে সকল ভদ্রসন্তান তোমাদের আশ্রয় গ্রহণ করিবে তাহারা যেন কোনরূপ লাঞ্ছিত না হয়।

এমারেল্ড থিয়েটারের কার্য্যকালে, গিরিশবাবুর পূর্ণচন্দ্র ও বিষাদ নামে দুইখানি নাটক অভিনীত হয়। দুইখানি নাটকই আজি পর্য্যন্ত নাট্যামোদিগণের নিকট পরম আদরের জিনিষ হইয়া রহিয়াছে। "পূর্ণচন্দ্র" অভিনয় দর্শনে সুপ্রসিদ্ধ রেজ এণ্ড রাইয়েৎ" পত্রের প্রতিভাশালী সম্পাদক ডাক্তার শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছিলেন,—

"এক 'পূর্ণচন্দ্রে' গোপালবাবুর ২০ হাজার টাকার উপর আদায় হইয়াছে।" দুই বৎসরের পর গোপালবাবুর সখ মিটিয়া গেল, তিনি উক্ত নাট্যশালা বাবু মতিলাল শূর প্রভৃতি কয়েকজন অভিনেতাকে ভাড়া দিলেন। এই স্থানে গিরিশ বাবুর সহিত গোপালবাবুর কার্য্য-সম্বন্ধ ফুরাইল। তিনি পুনরায় ষ্টার থিয়েটারে আসিয়া ম্যানেজারের পদ গ্রহণ করিলেন।*

(ক্রমশঃ)

ত্রিদিবারোহণ।

[নটগুরু মহাকবি গিরিশচন্দ্রের স্বর্গারোহণে।]

(শ্রীললিত মোহন চট্টোপাধ্যায় লিখিত।)

প্রথম দৃশ্য।

নন্দন কানন।

অপ্সরাগণের প্রবেশ।

গীত।

আয় সই গাঁথি হার পারিজাত তুলি থরে থরে।
যতনের ধনে সাজায়ে কুসুমে চল সবে আনি অমর পুরে॥
আয়লো সাজিয়া পূত বসনে, মঙ্গল গীতি গাহিয়া সুতানে
ঢালিয়ে শুভ্র পবন হিল্লোলে লয়ে আসি গিয়ে বাণী তনয়েরে॥
কাতর তনু বহি ধরাভার, শান্তি দানিব ঢালি সুধাধার,
শান্ত হইবে শান্তিধামে শ্রান্তি ক্লান্তি যাইবে দূরে॥

[সকলের প্রস্থান।

---

* গিরিশবাবুর জীবনের নানা কথা, গল্প, প্রবন্ধ প্রভৃতি আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কক্ষ।

কবিবরের দেহপার্শ্বে আত্মীয় বন্ধুগণ।

(শূন্যে অপ্সরাগণের প্রবেশ।)

গীত।

অনন্ত ঘুমে পার্থিব তনু ঘুমাইছে হের সজনী।
সূক্ষ্মদেহ জ্যোতি ধরিয়া আসে বাহিরিয়া আপনি॥

(দেহ হইতে জ্যোতির্ম্ময় সূক্ষ্মদেহের প্রকাশ।)

ধর ধর সই যতন করে,   ব্যথা যেন লো না লাগে শরীরে,
তাপিত তনু ধরার তাপে (কত) সয়েছেন দিবা যামিনী॥
এস এস এস শান্তিধামে,   মায়ের তনয় মায়ের সদনে,
শান্তি পাইবে তাপ দূরে যাবে কোলে তুলে লবে জননী॥
মায়ের তনয় মায়ের কোলে,   চির আনন্দে রহিবে ভুলে,
প্রেম পুলকে পূরিবে হৃদয় পেয়ে মাতৃপদ তরণী॥

[সূক্ষ্মদেহ লইয়া অপ্সরাগণের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

কলিকাতা—বিডন ষ্ট্রীট।

(অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের প্রবেশ।)

গীত।

ভারত ভুবন হল আঁধারে মগন।
কবিকুল রবি আজি অস্তে করিল গমন॥
নাট্যামোদী সুধিবৃন্দে,   রেখেছিল যে চির আনন্দে,
কীর্ত্তি-কুসুম-সৌরভ যার ব্যাপিয়া রয়েছে ভুবন।
কালের কুটীল চক্রবশে,   হেন জন গেল স্বরগ বাসে,
জগত পুরিল হা হুতাশে কাতরে কাঁদিছে ভক্তগণ॥

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

কাশীমিত্রের ঘাট।

কবিবরের বন্ধুগণ, ভক্তগণ, আত্মীয়গণ, ইত্যাদি মধ্যে

জ্বলন্ত চিতা।

বন্ধুগণের গীত।

আঁধার হেরি এ ধরা হৃদয় বেদন সহে না।
গাহি সুললিত ছন্দে বন্দে কে আর হরিবে বেদনা॥
যে কভু এসেছে তোমার কাছে, প্রেমডোরে তব বাঁধা পড়িয়াছে,
সে বাঁধন ছিঁড়ে তুমি ত অবাধে গেলে—ফিরে আর চাহিলে না।
রহিল যাহারা বাঁধা প্রেমডোরে—সহিবে চির বেদনা॥
নাট্যশালা হইল আঁধার, সুমধুর বীণা বাজিবে না আর,
ভাঙ্গিয়াছে বীণা ছিঁড়িয়াছে তার আর ত সে তান উঠিবে না।
নীরব কোকিল আর ত কখন শুনিতে সে তান পাব না॥

ভক্তগণের গীত।

বিফলে রোদন করি কি হইবে আর বল না।
কালের কঠোর কানে রোদন ত কারও পশে না।
আমাদের শেষ কায, এস ভাই করি আজ
ধরিয়ে দীনের সাজ বিসর্জন দিব প্রতিমা।
জয় রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ হরি হরি বোল বল না॥
নগ্ন চরণে শুভ্র বসনে, এস ভাই এস ভকতগণে
মুছ আঁখিধার—চাও ফিরে এমনটীত আর হবে না।
জয় রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ হরি হরিবোল বল না॥

[দাহ অন্তে সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

অমরাবতী,—বাণীমন্দির।

সরস্বতী, কলা—সঙ্গিনীগণ।

(শূন্যে কবিবরের সূক্ষ্মদেহ লইয়া অপ্সরাগণের প্রবেশ।)

গীত।

এনেছি যতনে যতনের ধনে ধর গো জননী ধর গো।
ঢালি নিরমল শান্তিধারা ধরার তাপ হর গো॥
সহিয়া নিয়ত কঠোর ধরায়, তাপতপ্ত হয়েছে গো কায়,
কোলে তুলে আদরের সুতে—শান্ত তাহারে কর গো॥
সাধিতে তোমার কায, কতই পেয়েছে লাজ,
তার গো তারিণী আজ শান্তিধারা ঢাল গো॥

(সরস্বতী দেবীর পার্শ্বে কবিবরের জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি দণ্ডায়মান)

কলাসঙ্গিনীগণের গীত।

মায়ের ছেলে মায়ের কোলে এসেছে আজ ঘুরে ফিরে।
মায়ে পোয়ে মিলে গেছে—(যত) ধরার বেদন গেছে দূরে॥
মায়ের কার্য্য সাধিয়া ধরায় তনয় এসেছে ফিরে,
আদরের ধন আদরে জননী নিয়েছেন কোলে করে,
শান্তি সদনে চির শান্তিতে রহিবে মায়ের ঘরে॥

যবনিকা।

———

বসন্তোৎসব গীতি। *

(শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত)

আওল ঋতুরাজ মোহন সাজে।
সুন্দর দশদিশি, হাসত মধুর হাসি,
হরষে খেলত নিশি, নিশানাথ প্রেমে ভাসি
কোয়েলা কুজনে প্রাণে ফুলশর বাজে॥
নবঘনশ্যাম সনে প্রেমনিধুবনে,
খেলে হোরি রাধাপ্যারী গোপিনীগণে,
রঙ্গিলা ব্রজবালা, দেয়ত পিচ্‌কারী কালা,
আবীরে অধীরা যত, কুঙ্কুম মারে তত,
মিনতি করত সবে মানভয়লাজে :—
"নিবার' নিবার' হরি, মেরোনা আর পিচ্‌কারী,
বসন ভিজল হেরি, কেমনে ভবনে ফিরি;
ক্ষম হে রসরাজ, রাখ রমণীর লাজ,
লাজহীন মনোচোরা, আকুলা অবলা মোরা,
প্রাণমন ডালি দিনু চরণ সরোজে॥"

---

* রাগিণী—বসন্তবাহার; তাল—একতালা। চোরবাগান, মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীটস্থ সুপ্রসিদ্ধ এক্‌, ডি, ইউনিয়নের সভাগণ কর্ত্তৃক দোলপূর্ণিমা রজনীতে গীত।

সঞ্জীবনীর ছটফটানি।

(শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত)

সহৃদয় পাঠকবর্গ! কয়েক মাস পূর্ব্বে আমাদের পত্রিকায় "সঞ্জীবনীর অন্তর্দ্দাহ" নামক প্রবন্ধ পাঠে থিয়েটার বেচারার প্রতি প্রাণসখি সঞ্জীবনীর মর্ম্মান্তিক বিদ্বেষের বিষয় আপনারা আভাষে যথেষ্ট অবগত হইয়াছেন, এইবার আবার একবার তাঁহার "ছটফটানির" বিষয় জ্ঞাত হউন! ব্যাপার সেই এক;—সেই থিয়েটার বিদ্বেষ—সেই "নটী আক্রমণ!"

নটগুরু গিরিশবাবুর পুত্র অভিনেতৃপ্রবর শ্রীমান সুরেন্দ্রনাথ ঘোষের সাহায্য-রজনীতে সেবার বিপুল জনসঙ্ঘ দর্শনে সখি সঞ্জীবনীর রুচি-বিকার বিষম চাগিয়া উঠিয়াছিল! এবারে ব্যাপার আরও কিঞ্চিৎ গুরুতর—সুতরাং এবার সখীর শুধু "অন্তর্দ্দাহ" নহে—শয্যাকণ্টকী ধরিয়া বিষম ছট্‌ফটানি ধরিয়াছে। সেদিন শোভাবাজারের রাজা শ্রীল শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের প্রাসাদে পূজনীয়া ভাইসরাণী লেডি হার্ডিঞ্জ মহোদয়ার অভ্যর্থনার জন্য একটা বিরাট উৎসব আয়োজন হইয়াছিল। দেশের অনেক সম্ভ্রান্ত মহিলাবর্গ ঐ উপলক্ষে নিমন্ত্রিতা হইয়াছিলেন এবং রাজসহধর্ম্মিণী শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী রাণী লেডী হার্ডিঞ্জকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য স্বয়ং একখানি সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। সেই সঙ্গীতখানি ষ্টার থিয়েটার সম্প্রদায়ভুক্ত অভি-নেত্রীগণ কর্ত্তৃক ঐ রাত্রে লেডী হার্ডিঞ্জ এবং উপস্থিত সম্ভ্রান্ত মহিলা-গণের সম্মুখে গীত হয়। তাহার পর শুদ্ধ উক্ত অভিনেত্রীগণ কর্ত্তৃকই গিরিশবাবুর সেই সুন্দর গীতিনাট্য "আবুহোসেন" অভিনীত হয়। পুরুষের ভূমিকা স্ত্রীলোকের দ্বারা অভিনীত হইয়াছিল। এইখানেই

সঞ্জীবনীর সুরুচির তুলার গাদায় আগুন লাগিল! এই ব্যাপারে সখি কি বলিলেন তাহা শুনুন :—

"আমরা অবগত হইলাম,—একজন উচ্চপদস্থা মহিলা কোন শ্রেণীর স্ত্রীলোক নাচে তাহা লেডী হার্ডিঞ্জকে জানাইবার জন্য গত মঙ্গলবার দিন তাঁহার নিকট গমন করিয়াছিলেন; তিনি নর্ত্তকীদের প্রকৃতির কথা বুঝাইয়াছিলেন; কিন্তু "স্ত্রীলোকের অভিনয়" ব্যাপারের মর্ম্ম লেডী হার্ডিঞ্জকে বুঝাইয়া দিতে পারেন নাই। তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন, হয়তো রাজবাটীর কুলাঙ্গনারাই অভিনয় করিবেন, তাই তৎসম্বন্ধে কোন প্রতিবাদ করেন নাই। যদি জানিতেন যে, ব্যবসাদার থিয়েটারের অভিনেত্রীগণ অভিনয় করিবে, তবে লেডী হার্ডিঞ্জকে তাহাদের কথাও বুঝাইয়া দিতেন।" সহযোগিনীর এই প্রলাপে আমাদের শ্রদ্ধেয় "হিতবাদী সম্পাদক প্রবর" কি মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহাও আমাদের পাঠকবর্গের সান্ত্বনার নিমিত্ত কতকাংশ উদ্ধৃত করিলাম :—সঞ্জীবনী ও তাহার উল্লিখিতা উচ্চপদস্থা মহিলা হিন্দুসমাজ হইতে নাম খারিজ করিয়া কি এতই পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন হইয়া গিয়াছেন যে, রাজবাটীর কুলাঙ্গনারা সং সাজিয়া অভিনয় করিবেন বলিয়া সত্য সত্যই তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন? সহযোগিনী নিতান্ত পাগলিনী না হইলে, সম্ভ্রান্তবংশীয়া কুলাঙ্গনাদিগের সম্বন্ধে এমন গুরুতর কথা পত্রস্থ করিতে নিশ্চিত সঙ্কুচিত হইতেন। হিন্দুর চক্ষে এই ব্যাপার এতই কুরুচিজনক ও দুর্নীতিমূলক বলিয়া প্রতিভাত হয় যে, ঐরূপ নির্দ্দেশ ঘোর মানহানিকর বলিয়া বিবেচিত হওয়াই স্বাভাবিক!"

আমরা হিতবাদী সম্পাদক প্রবরকে বলি যে সহচরীর এরূপ উৎকট বিকারে এরূপ "মিষ্ট ঔষধ" প্রয়োগ ঠিক উপযুক্ত হয় নাই। আজ যদি স্বর্গীয় কাব্যবিশারদ মহাশয় জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে

তিনি এই "বিবস্ত্র" বিষম ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া প্রিয়সখীর বিকার অনেকটা দূর করিতে পারিতেন।

আচ্ছা,—জিজ্ঞাসা করি, প্রাণসখীর থিয়েটারের উপর এতটা বিদ্বেষের কারণ কি? সকল সভ্যদেশে,—সভ্যতার উজ্জ্বলালোকে উদ্ভাসিত পৃথিবীর সকল সমাজেই তো থিয়েটারের যথেষ্ট আদর আছে। সখি স্বয়ং তো আপাদমস্তক প্রতীচ্য আচার-ব্যবহারের অনুকরণকারিণী উচ্চশিক্ষার পক্ষপাতিনী মূর্ত্তিমতী সভ্যতার বাণী। তবে কিসের জন্য তিনি এ দেশের থিয়েটারের উপর এরূপ খড়্গধারিণী? সভ্য-সমাজেই তো বলিয়া থাকে 'A nation is known by its theatre'! তাহা হইলেই বা থিয়েটারের অস্তিত্বলোপ যুক্তি সঙ্গত কি করিয়া বলি?

তবে কি থিয়েটার নটী-সংশ্লিষ্ট বলিয়া প্রাণসখির এরূপ নাসিকা-কুঞ্চন—তাহার বিরুদ্ধে এরূপ কটী-বন্ধন—তাহার মূলে কুঠারাঘাতের জন্য এরূপ বিভীষিকামূর্ত্তি ধারণ? ভাল তাহাই যদি হয়—আমরা তিলমাত্র সখিকে দোষ দিতে পারি না! সমাজে নটীগণ অতি ঘৃণার পাত্রী সন্দেহ নাই; তাহাদের সংস্পর্শ অত্যন্ত দোষনীয়—অত্যন্ত রুচি-বিরুদ্ধ দুর্নীতিমূলক—ইহা আমরা কিছুতেই অস্বীকার করিতে পারি না! কিন্তু তাহা হইলে থিয়েটার সম্প্রদায় কি ভাবে গঠিত করিতে হইবে সে বিষয়ে প্রাণসখি কৃপা করিয়া একটা সুযুক্তি প্রদান করিয়া আমাদের চিরপ্রেমে আবদ্ধ করিয়া রাখুন না! এতবড় একটা বৃহৎ ব্যাপার, এরূপ একটা দু দশ লক্ষ টাকার ব্যবসায়—এই চারিটী পাঁচটী থিয়েটার প্রাণসখির প্রেমে অন্ধ হইয়া—তাঁহার অভিমানে ব্যথিত হইয়া, থিয়েটার কর্ত্তৃপক্ষগণ তো এক কথায় তুলিয়া দিতে পারেন না! এক কথায় তো একসঙ্গে এতগুলি টাকা জলে দিয়া—প্রায় সহস্রাধিক "নিরাকার" সৃষ্ট হতভাগ্য জীবের অন্ন মারিতে পারেন না! থিয়েটার

সম্প্রদায়ে যে সমস্ত প্রাণীর গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান হইয়া থাকে, তাহাদের সকলগুলির ভার কি প্রাণসখি বহন করিতে প্রস্তুত আছেন? এই এতগুলি প্রাণী কি প্রাণসখির মধুভক্ষ হইতে খোরাক পাইয়া জীবন-ধারণ করিতে পারিবে? যদি তাহা সম্ভব হয়—তাহা হইলে আমরা একবার থিয়েটারকর্ত্তৃপক্ষগণকে বলিয়া দেখি;—আমরা না হয় সকলে মিলিয়া থিয়েটারগুলি বাংলাদেশ হইতে একেবারে নিশ্চিন্তপুরে পাঠাইয়া দিই এবং প্রাণসখির প্রেমে আফিং ধরিয়া অন্য রকম আনন্দের ব্যবস্থা করি!

সখির আমাদের বাতিক তো বড় কম নয়! যে রঙ্গমঞ্চে বার-বণিতারা অভিনয় করে—সেই রঙ্গমঞ্চে তাহাদের অনুপস্থিতকালেও যুবকগণের গমন করা অকর্ত্তব্য!* বড়ই বিপদের কথা! সখি সঞ্জীবনী সুরুচির ধ্বজা কাঁধে করিয়া বড়ই নাস্তানাবুদ হইয়া পড়িয়াছেন? যে স্থানে বারাঙ্গনাগণ বিচরণ করে,—সেস্থান বারাঙ্গনা শূন্য থাকিলেও সখী সেখানে পদার্পণ করিবেন না! সুরাপানাসক্ত এবং বেশ্যাশক্ত মুচি যদি পাদুকা নির্ম্মাণ করে—প্রাণসখী কোমলচরণে সে পাদুকা পরিধান করিবেন না!—মদ খাইয়া সূত্রধর যদি বেশ্যাবাড়ী যায় তাহা হইলে তাহার হস্ত-নির্ম্মিত চৌকিতে বসিয়া প্রাণসখি কুরুচিকে প্রশ্রয় দিবেন না! ভাড়াটিয়া গাড়ী, রেলে বা ট্রামে বারাঙ্গনাগণ আরোহণ করেন বলিয়া প্রাণসখী ঐ সমস্ত যানে আরোহণ করিবেন না! পথে ঘাটে অশ্ব-গরু কুকুর-ছাগল ইত্যাদি গৃহপালিত পশুগণ নগ্নাবস্থায় বিচরণ করে—প্রাণসখী চক্ষে দিবানিশি "ঝাটা" বাঁধিয়া থাকিবেন!

---

* সংপ্রতি কলিকাতার "ষ্টুডেণ্ট ক্লবে"র সভ্যগণ "কোহীনুর" রঙ্গমঞ্চে "বাজীরাও" নাটক অভিনয় করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই অজুহাতে সখী সঞ্জীবনীর বদন হইতে ছাত্রসমাজের উদ্দেশে অবিরলধারে গরল বর্ষিত হইয়াছিল। ছাত্রসমাজের অপরাধ—নটী-পদ-স্পর্শে অপবিত্র রঙ্গমঞ্চে উঠিয়া তাঁহারা অভিনয় করিয়াছিলেন!

এ অবস্থায় সখিকে লইয়া কি করা যায়? আমার বোধ হয় খুব বড় বড় বাঁশের ডগায় চড়িয়া প্রাণসখি তাঁহার দল বল লইয়া বেড়াইতে থাকুন—তাহা হইলে তাঁহার সুরুচির কোন ক্ষতি হইবে না!

থিয়েটার কর্ত্তৃপক্ষগণ বারাঙ্গনাকে সম্প্রদায়ভুক্ত করিয়া নিজেরাও কম বিব্রত নহেন। সখী স্বয়ং উদ্যোগিনী হইয়া ইহার যদি কোনরূপ বিলিবন্দোবস্ত করিতে পারেন, তাহা হইলে বড়ই ভাল হয়। থিয়েটারে স্ত্রীলোকের ভূমিকা স্ত্রীলোকের দ্বারায় অভিনীত না হইলে কিছুতেই চলে না;—দর্শকবৃন্দ কেহই পয়সা দিয়া "মোচমুণ্ডার" দল দেখিতে যাইতে চাহেন না। কবিবর ৺রাজকৃষ্ণ রায় একবার তাহা চেষ্টাও করিয়াছিলেন। সখিরই সম্প্রদায়ভুক্ত সুরুচিসম্পন্ন বিস্তর মহাত্মা গোপনে রঙ্গালয়ে আসিয়া আনন্দ উপভোগ করেন। স্ত্রীলোকবর্জ্জিত রঙ্গালয়ে তাঁহারাই কি ভুলেও পদার্পণ করিবেন? অশিক্ষিতা শাঁখাসিন্দুর-শোভিতা অসূর্য্যম্পশ্যা হিন্দুকুলমহিলা সমস্ত দিবস আপন আপন গৃহ-কর্ম্মেই ব্যস্ত, স্বামীপুত্রের সেবাযত্নেই বিভোর! স্বামীপুত্রের সম্মুখেই কথা কহিতে তাঁহারা লজ্জাবনতমুখী হইয়া থাকেন—তাঁহাদের তো প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করানো একেবারেই সম্ভবপর নয়! হয়তো একথা একদিন যদি কেহ কোন হিন্দুরমণীর নিকট প্রস্তাব করেন, তাহা হইলে কাল্পনিক ভয়েই তন্মুহূর্ত্তেই সেই অভাগিনীর মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে। সুতরাং এমন অবস্থায় আমরা সুযুক্তিময়ী সখির শরণাগত হইলাম—তিনি এই মহাদায়ে আমাদের রক্ষা করুন। তিনি কতক-গুলি উচ্চশিক্ষিতা সুরুচিসম্পন্না স্বাধীনা মহিলাকে আমাদের সম্প্রদায়ে পাঠাইবার ব্যবস্থা করুন! যাহাতে তাঁহারা সত্বর আমাদের রঙ্গালয়ে আসিয়া যোগদান করেন—সখি সে ব্যবস্থা করুন, তাঁহারা রঙ্গালয়ে যোগদান করিলেই, আমাদের রঙ্গালয়-সংসৃষ্ট বারাঙ্গনাগণকে আমরা তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া কুলায় বাতাস

দিয়া গঙ্গাপার করিয়া দিয়া—তাহাদের স্থান প্রথমতঃ গোবর দিয়া ধুইয়া—পরে ফেনাইল দিবা রগড়াইয়া সাফ করিয়া—পরে বোতল বোতল স্বদেশী এসেন্স সেইস্থানে ঢালিয়া সৌগন্ধযুক্ত করিয়া—তাহার পর উপর্য্যুপরি আচার্য্যপ্রবরকে দিয়া সাতদিন তথায় ধর্ম্মবক্তৃতা করাইয়া সেই সুপবিত্রস্থানে প্রাণসখি নির্ব্বাচিতা মহিলাগণকে বাহাল করিয়া, নিজেরাও ধন্য হইব—দেশের লোককেও ধন্য করিব—এবং প্রাণসখিরও দশহাত বুকখানা আরও দুহাত বাড়াইয়া তুলিব—আর আনন্দে দুহাত তুলিয়া নাচিয়া গাহিব—

"চাঁদ চাঁদ চাঁদ চাঁদের বামে—চাঁদবদনী দাঁড়াল!"

বাঙ্গলার রঙ্গালয়।

(শ্রীঅতুলচন্দ্র বসু বি, এল লিখিত)

রঙ্গালয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য চিত্তশুদ্ধি অথবা লোকশিক্ষা। একটী মহান উদ্দেশ্য লইয়া নাটক গঠিত হয়—রঙ্গালয় সেই নাটকের প্রাণ। নাটক যতই সুলিখিত, সুগঠিত হউক না কেন, অভিনীত না হইলে সে নাটক সম্পূর্ণরূপে অভিব্যক্ত হয় না। তাহার প্রচ্ছন্ন মহান উদ্দেশ্য জনসধারণের জ্ঞানচক্ষুর অন্তরালে রহিয়া যায়। নাটকাধিগত ভাবসমূহ পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। অভিনয় নাটককে সেই পূর্ণতা প্রদান করে। দক্ষ অভিনেতার কলাকৌশলে, তাঁহার বাক্যোচ্চারণ ভঙ্গীতে হস্ত পদাদির ভাবসূচক সঞ্চলনে নাটকের প্রচ্ছন্ন মহান উদ্দেশ্য প্রকটিত হইয়া পড়ে এবং অজ্ঞাতে দর্শকমণ্ডলীর অন্তকরণে প্রবেশ করে। জনসাধারণের সকলেই শিক্ষিত নহে, সকলেই প্রতিভাবান নহে। যাহারা অশিক্ষিত, যাহারা নিরক্ষর, তাহাদের শিক্ষার জন্যই,

তাহাদের হৃদয়ের মলিনতা দূর করিয়া জ্ঞানালোক দান করিবার জন্যই রঙ্গালয়ের সৃষ্টি। জনসাধারণের হৃদয় উন্নত করা, পুণ্যের প্রতিষ্ঠা, পাপের পতন, লালসার অতৃপ্তি, হিংসার আত্মহত্যা, অত্যাচারের হাহাকার প্রভৃতি ধর্ম্মাধর্ম্মের অবশ্যম্ভাবী পরিণামের সজীব মূর্ত্তি, জন-সাধারণের সংসারপাপ পীড়িত, জ্যোতিহীন নয়নের সম্মুখে ধারণ করিয়া তাহাদিগকে শিক্ষাদান করা রঙ্গালয়ের উদ্দেশ্য। অথচ এ শিক্ষায় গুরুমহাশয়ের কশাঘাত নাই, উপদেষ্টার তিক্ত ভর্ৎসনা নাই, ব্রহ্মচর্য্যের আত্মনিপীড়ন নাই। এ শিক্ষা প্রমোদের, সুখের। এ শিক্ষায় কষ্ট নাই, যন্ত্রণা নাই, অধিকন্তু তৃপ্তি আছে—আনন্দ আছে। তাই রঙ্গালয়ের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য—চিত্তরঞ্জন। যে দেশের রঙ্গালয়ে এই দুইটি উদ্দেশ্যের যত অধিক শোভন সামঞ্জস্য আছে, সে দেশের রঙ্গালয় তত অধিক উন্নত। কিন্তু দেখা যায় অনেক সময়ে গৌণ মুখ্যের স্থান অধিকার করিয়া বসে। ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম, মানবের ভূয়োদর্শিতার অভাবের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। সেইজন্য অনেক সময়ে রঙ্গালয়ের কর্তৃপক্ষগণ চিত্তশুদ্ধি অপেক্ষা চিত্তরঞ্জনকেই আপনাদের কর্ত্তব্য বলিয়া বাছিয়া লন। লোকশিক্ষার প্রতি তাঁহারা ততটা নজর দেন না। ইহাতেই রঙ্গালয়ের অধঃপতন এবং সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জাতির অধঃপতন। রঙ্গালয় এইরূপ লক্ষভ্রষ্ট হয় বলিয়াই শ্রেষ্ঠ মনিষীগণ রঙ্গালয়ের আদর করেন না বরং ঘৃণা করেন। পাশ্চত্য জগতের অনেক বড় বড় পণ্ডিত রঙ্গালয়ের নিন্দা করিয়াছেন। আমাদের রঙ্গালয় ইউরোপীয় রঙ্গালয় অপেক্ষা সর্ব্বাংশেই ন্যূন। আমাদের রঙ্গালয়ের প্রধান দোষ রঙ্গালয় সমাজ পরিত্যক্ত গণিকা সংশ্লিষ্ট। অবশ্য উক্ত দোষ অপরিহার্য্য, তথাপি উক্ত দোষের জন্যই আমাদের নাট্যশালা সম্যক্ পরিপুষ্টি লাভ করিতে পারিতেছে না। বিলাতী রঙ্গিণীগণ, বিলাতী সমাজে বরেণ্যা, আদর-ণীয়া। কিন্তু আমাদের বঙ্গীয় রঙ্গিনীগণ অভিনয় নিপুণা হইলেও রঙ্গা-

লয়ের বাহিরে তাহাদের আদর নাই। এবং তাহার প্রত্যাশাও বৃথা।

ইউরোপে স্ত্রী স্বাধীনতা আছে, স্ত্রীপুরুষ একত্রে মেলামেশা করিতে পারে কিন্তু আমাদের দেশে স্ত্রী স্বাধীনতা নাই। সুতরাং অভিনেত্রীর প্রয়োজন হইলে গণিকা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। একদিন ছিল যখন আমাদের দেশে নটীজাতীয় এক সম্প্রদায় ছিল—সঙ্গীত তাহাদের ব্যবসায়। সমাজ-সমারোহে তাহারা অর্থবিনিময়ে আপনাদের নৃত্যগীত নিপুণতার পরিচয় দিত, কিন্তু তাহারা সামান্য বারবণিতা ছিল না। নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যেই তাহাদের বিবাহ হইত। সমাজ পরিত্যক্ত হইলেও তাহারা নিজে এক সম্প্রদায় গঠিত করিয়া সমাজের অন্তর্ভূক্ত ছিল। এখনও উত্তর পশ্চিম প্রদেশে সে সম্প্রদায় কতকাংশে বিদ্যমান আছে; কিন্তু বাংলায় তাহার অস্তিত্ব নাই। অথচ কেবলমাত্র পুরুষ অভিনেতা লইয়া নাটক সর্ব্বাঙ্গসুন্দরভাবে অভিনীত হয় না। যাত্রা এবং ৺রাজকৃষ্ণ রায়ের রঙ্গালয় তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। অভিনেত্রীর অভাবে বাংলার নাট্যকলা ক্রমেই হতপ্রভ হইয়া পড়িতেছিল কিন্তু সুখের বিষয় বর্ত্তমান রঙ্গালয় সে নষ্টগৌরব পুনরুদ্ধার করিয়াছে। এবং আশা করা যায় বাংলার রঙ্গালয় সত্বরেই পূর্ণতা লাভ করিবে।

রঙ্গালয়ে গণিকা সংস্রব আছে বলিয়া অনেকে রঙ্গালয় ঘৃণা করেন। বিশেষতঃ রুচিবাগীশ ব্রাহ্ম ভায়াগণ রঙ্গালয়ের উপর হাড়ে চটা, কিন্তু সুখের বিষয় এই ঘৃণারভাব বহুজনব্যাপী নয়। রঙ্গালয় বাংলার জন-সাধারণের আদরের সামগ্রী। এক কলিকাতা সহরে চারিটী রঙ্গালয় সপ্তাহে তিনদিন নাটকাভিনয় করিতেছে। অভিনয়কালে রঙ্গালয় দর্শকে পূর্ণ হয়। যে দিন নূতন নাটক অভিনীত হইবে, সে দিন অনেক দর্শককেই স্থানাভাবে ক্ষুণ্ণমনে গৃহে ফিরিতে হয়। আট আনার টিকিট এক টাকা দু'টাকা দিয়া ক্রয় করিতেও তাঁহারা কুণ্ঠিত হন না।

যে দিন কোন বিশিষ্ট অভিনেতা বা অভিনেত্রীকে "বেনিফিট" দেওয়া হয়, সেদিনও রঙ্গালয়ে লোক আর ধরে না। ইহাতেই বুঝিতে পারা যায় রঙ্গালয় বাংলার জনসাধারণের প্রিয় হইয়াছে। বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে রঙ্গালয় আপন প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। রঙ্গালয়ের যতই দোষ থাকুক না কেন তথাপি বাঙ্গলার রঙ্গালয় বাঙ্গালীর প্রিয় হইয়াছে ইহাই রঙ্গালয়ের পক্ষে যথেষ্ট। জনসাধারণের এইরূপ অবিচলিত উৎসাহ পাইলেই রঙ্গালয় ক্রমে উন্নত হইবে, ক্রমেই পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে।

বঙ্গীয় রঙ্গালয় যে জনসাধারণের চিত্তরঞ্জনে সমর্থ হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারা গেল। এখন দেখা যাক আমাদের রঙ্গালয় দ্বারা রঙ্গালয়ের প্রধান উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে কিনা? অর্থাৎ রঙ্গালয় লোকশিক্ষা-দানে জাতীয় জীবন গঠনে সহায়তা করিতে পারিতেছে কি না?

রঙ্গালয়ের সাহায্যে লোকশিক্ষা তিনটী বিষয় সাপেক্ষ—প্রথম উৎকৃষ্ট নাটক, দ্বিতীয় উৎকৃষ্ট অভিনেতা এবং তৃতীয় সহৃদয় দর্শক। আমাদের দেশে রাজানুগ্রহপুষ্ট নাট্যশালা নাই। আমাদের সকল রঙ্গালয়গুলিই ব্যবসায়ের হিসাবে ব্যক্তি বিশেষের দ্বারা পরিচালিত। বর্ত্তমান যুগের বঙ্গীয় রঙ্গালয় যখন প্রথম খোলা হয় তখন তাহার কর্ত্তৃপক্ষগণের হৃদয়ে সর্ব্বজনীন উন্নতি উদ্দেশ্য ছিল না—কতকটা সখ, কতকটা লুপ্তনাট্যকলার পুনরুদ্ধার তাঁহাদিগকে রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠায় ব্রতী করিয়াছিল। এখনকার রঙ্গালয়ের সত্বাধিকারীগণ নাট্যশালা খুলিয়াছেন কেবল মাত্র লাভের জন্য। তথাপি আপনার স্বার্থ বজায় রাখিয়া যতটুকু কর্ত্তব্য পালন করিতে পারা যায় তাহাতে তাঁহারা কুণ্ঠিত নহেন। নাটকের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভিনয়ের জন্য তাঁহারা অকাতরে অর্থব্যয় করিতে প্রস্তুত। কিন্তু যেখানে অর্থের সহিত সম্বন্ধ, সেখানে আদর্শের অনুসরণ সম্পূর্ণভাবে ঘটিয়া উঠে না। ব্যবসায় চালাইতে

হইলে ক্রেতাকে সন্তুষ্ট রাখা অগ্রে কর্ত্তব্য। অর্থনীতির এই মূলমন্ত্রের বশবর্ত্তী হইয়া রঙ্গালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণকে দর্শকদিগের রুচি অনুযায়ী নাটকাভিনয় করিতে হয়। বিজ্ঞ কবিরাজের ন্যায় তাঁহাদিগকে দর্শকগণের রুচির নাড়ী টিপিয়া দেখিতে হয়। দর্শকগণ যাহা চান তাহা দিতে না পারিলে ব্যবসায় মাটী হইবে সর্ব্বদাই এই ভয় তাঁহাদের মনে জাগরূক। সুতরাং বাধ্য হইয়াই তাঁহাদিগকে সর্ব্বাগ্রে দর্শক-গণের চিত্তরঞ্জনের প্রতি অধিক চেষ্টা রাখিতে হয়। নাটককারগণের অবস্থাও তদনুরূপ। তাঁহাদিগকেও দর্শকগণের রুচির নাড়ী টিপিয়া উপযুক্ত নাটক রচনা করিতে হয়। দর্শকগণের মনঃপূত না হইলে বই কাটিবে না, রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষ তাহা অভিনয় করিবেন না—সদাই তাঁহাদের এই ভয়। অভিনেতাগণও তাদৃশ অবস্থাপন্ন। সুতরাং দেখা যাইতেছে দর্শকগণের রুচিই এ বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল। কিন্তু সকল দর্শকের রুচি সমান নহে। কেহ চাকের মধু চান, কেহবা কেংরা গুড়ের প্রত্যাশী। কাহারও রুচি ঐতিহাসিক, কাহারও আসক্তি সামাজিকে, আবার কেহ বা রঙ্গনাট্যের জন্য পাগল। নাটক-কারগণ ও রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষগণকে দর্শকগণের এইরূপ রুচিদ্বন্দ্ব লইয়া বড়ই বিব্রত হইতে হয়। কোন কূল রাখিবেন তাহা ঠিক করিতে না পারিয়া তাঁহারা স্রোতের টানে গা ভাসাইয়া দেন। তাহাতে রঙ্গা-লয়ের অবনতি অনিবার্য্য।

ক্রমশঃ

3/11

নাট্য প্রসঙ্গ।

"ষ্টার" থিয়েটারে নাট্যাচার্য্য শ্রীযুত অমৃতলাল বসু মহাশয়ের নব-রচিত নক্সাখানির মহলা চলিতেছে। শীঘ্রই ইহার অভিনয় হইবে।

* * * * *

নটগুরু গিরিশচন্দ্রের স্বর্গারোহণে শোক প্রকাশার্থ গত ২৭শে মাঘ শনিবার কলিকাতার চারিটি রঙ্গালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ অভিনয় বন্ধ রাখিয়াছিলেন।

* * * * *

"ষ্টার" থিয়েটারের সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা শ্রীযুত সতীশচন্দ্র বন্দ্যো-পাধ্যায় ইতিমধ্যে অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া অবকাশ গ্রহণ করিয়াছিলেন; সংপ্রতি স্বাস্থ্যলাভ করিয়া পুনরায় কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

* * *

সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাসিক শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের নূতন উপন্যাস "শীষমহল" বাহির হইয়াছে। সাহিত্য-জগতে শীষমহলের আদর হইয়াছে। বারান্তরে এই উপন্যাসের সমালোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

* * *

গত ২১শে মাঘ শনিবার খিদিরপুরের হেমচন্দ্র পাঠাগারের উদ্যোগে ১৩নং গড়বাড়ী রোডস্থিত বিদ্যালয় ভবনে সারস্বত সম্মিলনের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। এই উপলক্ষে পাঠাগারের কর্ত্তৃপক্ষগণ কবিবর রবীন্দ্রনাথের সুপ্রসিদ্ধ বিয়োগান্ত নাটক "বিসর্জ্জন" অভিনয় করিয়াছিলেন।

* * *

পণ্ডিত শ্রীযুত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের "খাঁজাহান লোডি" 'কেন্দ্রচ্যুতির কমিসনের' মত সকল রঙ্গালয় ঘুরিয়া এবার "কহিনুরে" উদয় হইয়াছেন! "খাঁজাহান লোডি" নামে নূতন হইলেও, তাঁহার পত্তন বহুদিনের। "কোহিনুরে" এই নূতন নাটকের মহলা চলিতেছে।

* * *

"বাজীরাও" প্রণেতা শ্রীযুক্ত মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় একখানি পঞ্চাঙ্ক ঐতিহাসিক নাটক লিখিতেছিলেন, সম্পূর্ণ হইয়াছে। "ষ্টার" থিয়েটারের কর্তৃপক্ষগণ মণিবাবুর নূতন নাটক খানি শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছেন। "বাজীরাও" লিখিয়া মণিবাবু স্থায়ী যশের অধিকারী হইয়াছেন, নূতন নাটক খানির প্রভাবে সে যশ উজ্জ্বলতর হইলেই আমরা সুখী হইব। "ষ্টার" থিয়েটারে শীঘ্রই এই নূতন নাটকের অভিনয় হইবে।

* * *

বজবজ—আর্য্য-সারস্বত-নিকেতনের কর্তৃপক্ষগণ লিখিয়াছেন,—"নাট্য-সাহিত্যে গিরিশচন্দ্র" সম্বন্ধে যাঁহার প্রবন্ধ সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবে। সারস্বত নিকেতনের কর্তৃপক্ষগণ তাঁহাকে একখানি রৌপ্য-পদক পুরস্কার দিবেন। শ্রীযুক্ত মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন। আগামী ৩০শে বৈশাখের মধ্যে—"সম্পাদক, আর্য্য সারস্বত নিকেতন, বজবজ, চব্বিশ পরগণা"—এই ঠিকানায় প্রবন্ধ পাঠাইতে হইবে।"

* * *

গত ১৭ই মাঘ বুধবার শোভাবাজারের স্বনামধন্য রাজা শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের ভবনে বড়লাট-মহিষী লেডী হার্ডিঞ্জ মহোদয়ার পদার্পণ হইয়াছিল। বড়লাট-মহিষীর সম্বর্দ্ধনার্থ ঐ দিন রাজা বাহাদুরের প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা 'দীপাবলি তেজে উজ্জলিত নাট্য-শালায়' পরিণত হইয়াছিল। এই উপলক্ষে "ষ্টার থিয়েটার সম্প্রদায়" কর্তৃক রাজ-ভবনে নাট্যাভিনয় হইয়াছিল। বড়লাট-পত্নী লেডী হার্ডিঞ্জ সে অভিনয় দেখিয়াছিলেন; দেখিয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলেন।

* * *

চৈতন্য লাইব্রেরীর সম্পাদক শ্রীযুত গৌরহরি সেন লিখিয়াছেন,—"স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র ঘোষের "নাট্য-প্রতিভা"সম্বন্ধে যে দুইজনের বাঙ্গালা

প্রবন্ধ সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবে, চৈতন্য লাইব্রেরির কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদিগকে দুইখানি রৌপ্য-পদক পুরস্কার দিবেন। রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন। আগামী ৩০শে জুনের মধ্যে, চৈতন্য-লাইব্রেরীর সম্পাদক, বিডনষ্ট্রীট, কলিকাতা, এই ঠিকানায় প্রবন্ধ পাঠাইতে হইবে। সাধারণের প্রতিযোগীতা প্রার্থনীয়।"

* * *

গত বাসন্তী পঞ্চমীতে বিনাপাণি বাণীর ধ্যান পূজার উৎসবানন্দে সঙ্গীতসমাজে সারস্বত সম্মিলন হইয়াছিল। কলিকাতার গন্যমান্য বরেন্য জনগণ এই উপলক্ষে সঙ্গীত সমাজে আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। এই উপলক্ষে কবিতা, গীতি, আবৃত্তি, গাথা, অভিনয় প্রভৃতির অনুষ্ঠান হইয়াছিল। সমাজের সভ্যগণ অমর কবি বঙ্কিমচন্দ্রের "কৃষ্ণকান্তের উইল" অভিনয় করিয়াছিলেন। এখানে স্ত্রী চরিত্রের অভিনয়ে পুরুষের কৃতিত্ব; সম্রান্ত, সুশিক্ষিত, উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণের অভিনয় প্রকৃতই যে পুলকজনক—তাহা বলাই বাহুল্য।

* * *

গত ১৩ই মাঘ শনিবার কলিকাতার স্কটিসচার্চ্চ কলেজের হলে স্বর্গীয় কবিবর নবীনচন্দ্রের স্মৃতি সম্মানার্থ সভা হইয়াছিল। শ্রীযুত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভার প্রারম্ভে একটি গান হইয়াছিল। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুত বিহারীলাল সরকার, শ্রীযুত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুত কুলদাপ্রসাদ মল্লিক, শ্রীযুত মন্মথমোহন বসু প্রভৃতি এবং স্বয়ং সভাপতি মহাশয় কবিবরের গুণকীর্ত্তন করিয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

* * *

গত ২৯শে পৌষ রবিবার "বাগবাজার সোশিয়াল ইউনিয়নের তৃতীয় বাৎসরিক অধিবেশন সভা সুশৃঙ্খলে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে স্বর্গীয় নট-গুরু গিরিশচন্দ্র ঘোষ এই ইউনিয়নের

সভাপতি ছিলেন। অনেক গুলি সুশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত যুবক এই ইউনিয়নে সংসৃষ্ট। উক্ত বাৎসরিক অধিবেশন উপলক্ষে ইউনিয়নের সভ্যগণ ইউনিয়নের পরিচালক ও নাট্যাচার্য্য সুলেখক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক কবিবর নবীনচন্দ্রের "কুরুক্ষেত্র" হইতে নাটকাকারে গ্রথিত "বীরের শোক" অভিনয় করিয়াছিলেন। অভিনয় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল। আমরা এই ইউনিয়নের সাফল্য প্রার্থনা করি।

* * *

গত ১৩ই মাঘ রবিবার কলিকাতা টাউনহলে ভারত-বিদিত সর্ব্বজনপ্রিয় কবিকুলশেখর শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথের সম্বর্দ্ধনা হইয়া গিয়াছে। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের উদ্যোগেই এই সম্বর্দ্ধনা-কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। কাব্যজগতে বিলাতী কবি সেলি, টেনিসন, কিটস, ব্রাউনিং প্রভৃতি যেরূপ সমাদৃত, আমাদের রবীন্দ্রনাথেরও সেইরূপ সমাদর। কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি শ্রীযুত সারদাচরণ মিত্র এই সম্বর্দ্ধনা-সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের গলায় মালা পরাইয়া দিয়াছিলেন; নাটোরের স্বনামধন্য সাহিত্যানুরাগী মহারাজ জগদীন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর রবীন্দ্রনাথকে স্বর্ণ-পদ্ম উপহার দিয়াছিলেন। মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর সুললিত সংস্কৃত কবিতা পাঠ করিয়াছিলেন। ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি শ্রীযুত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় স্বরচিত একটি কবিতা পাঠ করিয়াছিলেন। আমন্ত্রিতা সুশিক্ষিতা ব্রাহ্ম মহিলাগণ কবিবরকে ফুলের তোড়া-মালা উপহার দিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত রমেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী গজদন্তনির্ম্মিত ফলকে-মুদ্রিত রক্তবস্ত্রে আবৃত অভিনন্দন [illegible]রাছিলেন। সেদিন টাউনহলে অসংখ্য ব্যক্তির সমাগম হইয়াছিল। [illegible]বর রবীন্দ্রনাথের এই সম্বর্দ্ধনায় সাহিত্যানুরাগী মাত্রেই সন্তুষ্ট [illegible]াছেন, সন্দেহ নাই।

313

সম্পাদকের নিবেদন।

... 1912 ... BUILDING

নাট্যমন্দিরের সহৃদয় গ্রাহক ও গ্রাহিকাগণ,

আজ আমি আপনাদের নিকট সর্ব্বান্তঃকরণে কয়েকটি সনির্ব্বন্ধ নিবেদন করিতেছি। "নাট্যমন্দির" আপনাদের সকলেরই আদরের সামগ্রী, সেইজন্যই আমি এই নিবেদন পত্র আপনাদের গোচর করিতে সাহস করিয়াছি। এত অল্প সময়ের মধ্যে "নাট্যমন্দির" যে আপনাদের ন্যায় সাহিত্যানুরাগী সুধীগণের স্নেহ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইবে, তাহা আমি কল্পনাও করিতে পারি নাই। আপনারা যে শিশু নাট্যমন্দিরকে বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখিয়া থাকেন, আমরা তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাইয়াছি। দৈবাৎ কোন মাসে নাট্যমন্দির প্রকাশে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইলে আপনারা যৎপরোনাস্তি ব্যাকুলতা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। কেহ পত্র লিখিয়া, কেহ বা কষ্ট স্বীকার করিয়া কার্য্যালয়ে আসিয়া বিলম্বের কারণ অনুসন্ধান করেন। অনেকে এজন্য আমাকে যথেষ্ট অনুযোগও করিয়া থাকেন। আপনাদের এই আগ্রহ, অনুগ্রহ ও অনুযোগ নাট্যমন্দিরের সম্পাদন কার্য্যে আমাকে অধিকতর উৎসাহিত করিয়াছে। আমার প্রতি আপনাদের কঠোর অনুযোগ নাট্যমন্দিরের প্রতি প্রগাঢ় স্নেহের নিদর্শন মনে করিয়া অতঃপর নাট্যমন্দিরকে নিয়মিত ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া আপনাদের এ আদরের কথঞ্চিৎ প্রতিদান করিব—এরূপ সংকল্প করিয়াছি।

সহৃদয় গ্রাহক ও গ্রাহিকাগণ! ইদানীং নাট্যমন্দির প্রকাশে অযথা বিলম্ব হইতেছে, এবং এই বিলম্বের জন্য আমাকেই আপনাদের নিকট অপরাধী হইতে হইয়াছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে আমার একটি কৈফিয়ৎ দিবার আছে।—আপনারা নাট্যমন্দিরের গ্রাহক, অনুগ্রাহক ও পৃষ্ঠপোষক; আপনাদের অনুগ্রহের উপরেই নাট্যমন্দিরের জীবন

ময়ূণ নির্ভর করিতেছে ; সুতরাং নাট্যমন্দিরকে অনিয়মিত করিয়া আপনাদের বিরাগভাজন করা যে কখনই আমার অভিপ্রেত নয়—একথা বলাই বাহুল্য। আমার চেষ্টা যত্ন, আগ্রহ, অর্থ ও আয়াসের অভাবে যে নাট্যমন্দির অনিয়মিত হয় নাই—এ কথা আমি আপনাদের নিকট বিনীতভাবে নিবেদন করিতেছি। নাট্যমন্দিরের জন্ত আমি যথেষ্ট চেষ্টা যত্ন পরিশ্রম স্বীকার এবং প্রভূত অর্থব্যয় করিয়াও, মুদ্রাযন্ত্রের মহাপ্রভুদের কল্যাণে তাহাকে ইচ্ছানুযায়ী নিয়মিত ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে পারি নাই। নাট্যমন্দির যে ইদানীং অনিয়মিত হইয়া পড়িয়াছে—ইহার জন্য প্রত্যক্ষভাবে আমি আপনাদের নিকট অপরাধী হইলেও, পরোক্ষভাবে মুদ্রাযন্ত্রই অপরাধী এবং দায়ী।

কিন্তু পরের মুদ্রাযন্ত্রকে দায়ী ও অপরাধী করিয়া কোনও ফল নাই। প্রেস না করিয়া পত্রিকা বাহির করা এক প্রকার বিড়ম্বনা। একটি পত্রিকা-প্রকাশ ও সম্পাদনের দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুতর। পত্রিকার সম্পাদক ও পরিচালকেরা—সে দায়িত্ব যেরূপ বুঝেন, প্রেসের দায়িত্ব-জ্ঞানহীন কর্ম্মচারীরা সেরূপ বুঝিতে পারে না। নাট্যমন্দির এ পর্য্যন্ত পরের প্রেসেই ছাপা হইয়া আসিয়াছে ; সুতরাং তাহার অদৃষ্টে এ বিড়ম্বনা ভোগ অবশ্যম্ভাবী। আমি সহস্র চেষ্টা করিয়াও—প্রেসের কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট সহস্র কাতর অনুরোধ করিয়াও নাট্যমন্দিরকে নিয়মিত করিতে পারি নাই। তাই আজ আমি উদ্বেলিত হৃদয়ের আবেগে নাট্যমন্দিরের জন্য একটি বিস্তৃত মুদ্রাযন্ত্র স্থাপনে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

সহৃদয় গ্রাহকমণ্ডলী! আপনাদের মুখ চাহিয়াই—আপনাদের অনুগ্রহের উপর একান্ত নির্ভর করিয়াই—আমি এই বিরাট ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। আমার এই সংকল্প ইতিমধ্যেই কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। এই নূতন প্রেস সংস্থাপনে পাঁচ সহস্র টাকা মঞ্জুর করা

314 (A)

"প্রফুল্ল"

চতুর্থ অঙ্ক—পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

যোগেশের ভূমিকায় গ্রন্থকর্ত্তা স্বয়ং ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

যোগেশ।—(জনৈক লোকের প্রতি)

ওহে একটা পয়সা দাও না!—

ওহে একটা পয়সা দাও না!—

314

24 Aug 1912

হইয়াছে। কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের ১৩৭।১নং সুপ্রশস্ত ভবনে—যেখানে পূর্ব্বে সাহিত্য-পরিষদের কার্য্যালয় অবস্থিত ছিল সেইখানে—আমাদের নব প্রতিষ্ঠিত 'রামকৃষ্ণ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্' স্থাপিত হইতেছে। ইতি-মধ্যেই প্রেসের কিয়দংশ ক্রীত হইয়াছে; এবং টাইপ পত্র ও অন্যান্য জিনিষ পত্র ও উৎকৃষ্ট প্রেসের 'অর্ডার' দেওয়া হইয়াছে। বৈশাখ মাসের প্রারম্ভ হইতেই প্রেসের কার্য্যারম্ভ হইবে এবং বৈশাখের নাট্যমন্দির নূতন প্রেস হইতেই মুদ্রিত হইবে। নাট্যমন্দিরের অযথা বিলম্ব প্রকাশের জন্য আর আপনাদিগকে অনুযোগ করিতে হইবে না। অতঃপর আমরা নাট্যমন্দিরকে কিরূপ নিয়মিত, সুনিয়ন্ত্রিত ও সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর করিব—তাহা কার্য্যেই প্রকাশ পাইবে, এখন এসম্বন্ধে আমি কিছু বলিব না।

সহৃদয় গ্রাহক ও গ্রাহিকাগণ! উপসংহারে আপনাদিগকে আর একটি মাত্র অনুরোধ করিয়া আমি নিবৃত্ত হইব। নাট্যমন্দিরের প্রতিষ্ঠাকল্পে আমি আজ বহুব্যয়সাধ্য ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছি; এ সময় শিশু নাট্যমন্দিরের পক্ষ হইতে আমি আপনাদের নিকট কিঞ্চিৎ অনুগ্রহপ্রত্যাশী।—নাট্যমন্দিরের দ্বিতীয় বর্ষ অতীত প্রায়। এ সময় যদি আপনারা অনুগ্রহ করিয়া আপনাদের তৃতীয় বৎসরের বার্ষিক দর্শনী—যাহা শ্রাবণ মাসে দিতেন—এই সময় যদি আমার নিকট পাঠাইয়া দেন, তাহা হইলে আমার বিশেষ উপকার এবং নাট্যমন্দিরের প্রতি যথেষ্ট অনুরাগ প্রকাশ করা হয়। এই উপকার-টুকু করিয়া এ সময়ে আমার সাহায্য করিলে আমি সর্ব্বান্তঃকরণে অনুভব করিব যে, আপনারাই হৃদয়ের অজস্র অনুরাগ দিয়া আমার এই বহুব্যয়সাধ্য অনুষ্ঠানে সহায়তা করিয়াছেন,—সঙ্গে সঙ্গে নাট্য-মন্দিরকে উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর করিয়া লইয়াছেন। আমার এই নিবেদন পত্র পাঠের সঙ্গে সঙ্গে নাট্যমন্দিরের সামান্য দর্শনী সহ

আপনাদের অনুরাগপত্র পাঠাইয়া দিলে অনুগৃহীত হইব। আমি আগ্রহে আপনাদের আশীর্ব্বাদ প্রতীক্ষায় রহিলাম।

এই স্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে, নাট্যমন্দিরের তৃতীয় বৎসরের জন্য আমি এক অপূর্ব্ব অভিনব উপহারের অয়োজন অনুষ্ঠান করিতেছি। বঙ্গীয় নাট্যশালার যাবতীয় নাট্যকার,নাট্যাচার্য্য,সঙ্গীতাচার্য্য,অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের স্বরচিত সচিত্র বিস্তারিত জীবনকাহিনী এবার নাট্যমন্দিরের উপহার নির্ব্বাচিত হইয়াছে। বহুসংখ্যক হাফটোন চিত্রে, নানাবিধ জ্ঞাতব্য তথ্যে এই বিরাট পুস্তক পরিপূর্ণ হইবে। এই পুস্তকের আয়তন যে অতি বিরাট হইবে তাহা বলাই বাহুল্য। আগামী সংখ্যার নাট্যমন্দিরে নাট্যমন্দিরের উপহার তালিকা প্রকাশিত হইবে।

এই নিবেদন পত্রে এখন আর অধিক কিছু বলা বাহুল্য মনে করি। নাট্যমন্দিরের গ্রাহক ও গ্রাহিকাগণকে যথাযোগ্য অভিবাদন করিয়া আমি আমার নিবেদন পত্র শেষ করিলাম। আশা করি, আমার প্রার্থনা পত্র আপনাদের মর্ম্মস্পর্শ করিতে সক্ষম হইবে। নিবেদন ইতি,—

আপনাদের চিরানুগৃহীত

শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ দত্ত—

১৩৯ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নাট্য-মন্দির।

[বঙ্গের রঙ্গালয় সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা।]

দ্বিতীয় বর্ষ। } চৈত্র, ১৩১৮। { ৯ম সংখ্যা

অভিনেত্রীর রূপ।

(উপন্যাস)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত লিখিত।)

বিংশ পরিচ্ছেদ।

পুলিশ কর্ত্তৃক নলিনীর গ্রেপ্তারের কথা যথা সময়ে দুর্গার কা
গিয়া পৌঁছিল। সে ভয়বিহ্বলিত ও ব্যথিত চিত্ত লইয়া শাশুড়ীর কা
ছুটিয়া আসিয়া সকল কথা বিবৃত করিল। নলিনীর মাতা কাঁদিয়
কাটিয়া আকুল হইয়া মাথা চাপড়াইতে চাপড়াইতে বলিতে লাগিলেন
"যাহারা মরণ চায় না, মরণ তাহাদের কাছে আগে যায়; আর আমি
দিবারাত্রি মৃত্যু কামনা করিতেছি, নিষ্ঠুর যম আমাকে লইতে
চায় না।" দুর্গা বলিল, "মা! কাঁদিয়া এখন ফল কি? একটা উপায় ত
কিছু করিতে হইবে। স্বামী আমার পুলিশের হস্তে নির্য্যাতন ভোগ
করিতেছেন,—আর আমি সচ্ছন্দে ও নিরাপদে অট্টালিকায় বসিয়া

আছি! আমার এ মহাপাতক কি বিধাতা সহ্য করিবেন? আমার প্রাণের জ্বালা বুঝিবার—আমার দুঃখে দুঃখিত হইবার—তুমি ছাড়া আর এ সংসারে কে আছে? মা! তোমার পায়ে ধরিতেছি, এ বিপদ হইতে আমাকে উদ্ধার কর।" বলিতে বলিতে দুর্গার বেদনাক্লিষ্ট—জ্বালা-জর্জ্জরিত ক্ষুদ্র বুকখানি শতধারে ভাসিয়া যাইতে লাগিল। নলিনীর মাতা সযত্নে দুর্গার মুখখানি মুছাইয়া দিয়া বলিলেন, "পাগল মেয়ে! নলিনী কি আমার কেউ নয়? সে যে আমার বক্ষের শোণিত—অন্ধের যষ্টি—নয়নের তারা! আমার বাছাকে পুলিশে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে, একথা শুনিয়া আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে। পাষাণী আমি, মরণ আমার কাছে আসিতে ভয় পায়, তাই এখনও বাঁচিয়া আছি। যামিনীর কাছে সব কথা খুলিয়া বলা ভিন্ন আমি ত' আর অন্য উপায় দেখিতেছি না। কিন্তু নলিনীর উপর তাহার যেরূপ মনের ভাব, তাহাতে কতদূর কৃতকার্য্য হইব বলিতে পারি না। চল,—দুর্গানাম স্মরণ করিয়া যামিনীর ঘরে যাই,—তুমি দরজায় দাঁড়াইয়া থাকিবে।"

হৃদয়ের গুরুভার কোন' মতে চাপিয়া ধরিয়া নলিনীর মাতা ধীরে ধীরে যামিনীভূষণের শয়নকক্ষাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। বিষাদের ম্লান ছায়াখানির মত দুর্গা পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। তখন রাত্রি নয়টা বাজিয়া গিয়াছে। যামিনীভূষণ আপনার শয়নকক্ষে একখানি ইজি চেয়ারে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় নাকে সোনার চশমা লাগাইয়া 'আরব্য উপন্যাস' পাঠ করিতেছিলেন। জননীর মুখে নলিনীঘটিত সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, তিনি উত্তর করিলেন "ইতিপূর্ব্বেই আমি সে খবর পাইয়াছি, কিন্তু আমি কি করিতে পারি! বার বার ঘা খাইয়া যাহার চৈতন্য হইল না, তাহার পরিণাম এইরূপই হইয়া থাকে।"

নলিনীর মাতা করুণকণ্ঠে বলিলেন "বাবা! সবই বুঝিতেছি,

কিন্তু এরূপ খবর পাইয়া মার প্রাণ কি স্থির থাকিতে পারে? আমি তোমার হাতে ধরিয়া বলিতেছি, এ যাত্রা নলিনীকে রক্ষা কর। ভবিষ্যতে তাহার সম্বন্ধে কোনরূপ অনুরোধ করিব না। নলিনীকে যদি আমি আজ রাত্রের মধ্যে না দেখিতে পাই, তবে কাল সকালে আর আমায় জীবিত দেখিতে পাইবে না।" কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া যামিনীভূষণ কহিলেন "তুমিই আদর দিয়া তাহার মাথাটী খাইলে; সে যাহা হউক, যে জহরীর সহিত জুয়াচুরি করিয়া নলিনী পুলিশ কর্তৃক গ্রেপ্তার হইয়াছে, সে তাহার প্রাপ্য টাকা না পাইলে ছাড়িবে কেন? সে টাকাও অল্প নয়, প্রায় ছয় হাজার! এত টাকার যোগাড়—এই রাত্রে কেমন করিয়া হইতে পারে? আমি এখন উকিলের বাড়ী চলিলাম, দেখি—যদি কোনরূপ উপায় করিতে পারি!"

নলিনীর মাতার দুইচক্ষে দরধারা,—তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে আবার বলিলেন "বাবা! কোনমতে নলিনীকে এইবার উদ্ধার কর। আর তোমায় কখন কিছু বলিব না।" যামিনীভূষণ আর কোন' কথা না কহিয়া, নীচে নামিয়া আসিয়া গাড়ী প্রস্তুত করিবার হুকুম দিলেন।

এইবার দুর্গা যামিনীভূষণের স্ত্রীর পদতলে মলিন মালার মতন লুণ্ঠিত হইয়া সকাতরে বলিতে লাগিল, "দিদি! তুমি ত' আমার হইয়া একটী কথাও বলিলে না? তবে কি কোন' উপায় হইবে না? সত্য সত্যই কি আমার কপাল পুড়িল?" যামিনীভূষণের স্ত্রী অবিচলিত চিত্তে—অকুণ্ঠিতভাবে উত্তর করিলেন—"আমরা মেয়েমানুষ, ওসকল কথায় কি আমাদের থাকা উচিত? বিশেষতঃ—যে যেমন কর্ম্ম করিবে, তাহার ফলভোগ করিতে হইবেই হইবে।" দুর্গার প্রাণে বড় চোট লাগিল;—সে বুঝিল—এ স্বার্থের সংসারে মায়া-মমতা-সহানুভূতি—সহৃদয়তা—কিছুমাত্র নাই, কেবল আদান প্রদানের সম্বন্ধ। যে পরিমাণ দিবে, সেই পরিমাণ পাইবে। আমাদের বোধ হয়, কথাটা বড়ই সত্য!!

এদিকে যামিনীভূষণ সাজসজ্জা করিয়া জুড়ী জুতাইয়া তাঁহার আত্মীয়—হাইকোর্টের এটর্ণী নিতাই বাবুর বাটীতে উপস্থিত হইলেন। রুদ্ধদ্বারে—উভয়ের প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল নানারূপ পরামর্শ চলিল। তৎপরে দ্বার খুলিয়া নিতাইবাবু যামিনভূষণকে লইয়া আপনার ড্রয়িং রুমে প্রবেশ করিলেন। প্রায় চার পৃষ্ঠা ব্যাপি একটী লেখাপড়ার খসড়া তৈয়ারী হইল। কালবিলম্ব না করিয়া যামিনীভূষণ ও নিতাই বাবু থানায় উপস্থিত হইলেন। জহরী করমচাঁদ একখানি চেয়ারে বসিয়া ইন্‌স্পেক্টর বাবুকে আপনার "কেস্" বুঝাইতেছিলেন, আর একখানি ছোট টুলের উপর অদৃষ্টপীড়িত—বিধিনিগৃহিত—হতভাগ্য নলিনীভূষণ মাথাটী নীচু করিয়া বসিয়া আত্মহত্যার কল্পনা করিতে ছিল। জ্যেষ্ঠ যামিনীভূষণ ও নিতাইবাবুকে দেখিয়া সে প্রাণে একটু বল পাইল। ইন্‌স্পেক্টর বাবু নিতাই বাবুকে পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন, খাতির করিয়া পার্শ্বে বসাইলেন। যামিনীভূষণের জন্ত একখানি স্বতন্ত্র চেয়ার আনীত হইল, তিনিও উপবিষ্ট হইলেন। নিতাই বাবু ইন্‌স্পেক্টর বাবুকে বলিলেন "আমি আসামীর সহিত গোপনে কয়েকটী কথা কহিতে চাই, তাহাতে আপনার আপত্তি আছে কি?" ইন্‌স্পেক্টর বাবু উত্তর করিলেন, "কিছু মাত্র নয়। আপনি আসামীকে পাশের ঘরে লইয়া যাইতে পারেন।" নলিনীকে ডাকিয়া লইয়া নিতাইবাবু যথাস্থানে গিয়া কহিলেন"তোমার বিপদের কথা শুনিয়া—তোমার জ্যেষ্ঠ আমাকে সঙ্গে লইয়া এখানে আসিয়াছেন। তোমাকে বুঝাইবার বা উপদেশ দিবার আর কিছুই নাই, কারণ তোমার মাথা একেবারে বিগড়াইয়া গিয়াছে। এক্ষণে তোমায় জেলের হাত হইতে উদ্ধার করিতে হইলে—ছয়হাজার টাকার প্রয়োজন। কিন্তু তুমি ত' সব ফুঁকিয়া দিয়াছ, তোমার একটী পয়সাও নাই। এখন একমাত্র উপায় আছে। টাকার যোগাড় করিতে হইলে, তোমায় এই মর্ম্মে লেখাপড়া

করিয়া দিতে হইবে, যে তোমার মাতার মৃত্যুর পর—তুমি যে কোন' সম্পত্তির অধিকারী হইবে, তাহারই স্বত্ব তুমি যামিনীভূষণকে বিক্রয় কওলা লিখিয়া দিতেছ। ইহাতে জহুরী করমচাঁদের দেনা শোধ হইয়া তুমি আরও চারি হাজার টাকা হাতে পাইবে। এ প্রস্তাবে সম্মত আছ কি?"

যে নলিনী আত্মহত্যার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, তাহার পক্ষে এ প্রস্তাব—ঈশ্বরপ্রেরিত শুভ আশীর্ব্বাদের ন্যায় আনন্দপ্রদ বলিয়া বোধ হইল। সে সাগ্রহে উত্তর দিল—"এ প্রস্তাবে আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত।"

নিতাইবাবু। উত্তম, কিন্তু একটা কথা আছে। এ রাত্রে ষ্টাম্পের উপর লেখাপড়া হইতে পারে না। আমার দায়ীত্বে খসড়ায় উপর সই করাইয়া—আমি এ টাকা দিতে পারি, চেক বইও সঙ্গে আনিয়াছি। কিন্তু ষ্টাম্প চড়াইয়া—রীতিমত লেখাপড়া হইলে, যদি তুমি সহি না কর, তবে আবার পুলিশ কেসে পড়িবে। এইটুকু স্মরণ রাখিও।

নলিনী। এ জীবনে আর কখনও প্রতারণা করিব না—এটা স্থির জানিবেন। এইবার আমায় রক্ষা করুন,—অতঃপর দেখুন—জীবন-স্রোত নূতন পথে পরিবর্ত্তিত করিতে পারি কিনা?

এইবার নিতাই বাবু খসড়া বাহির করিলেন, আপনার ফাউন্‌টেন্ পেন্‌টী নলিনীর হাতে দিয়া বলিলেন "সহি কর"। নলিনী স্বাক্ষর করিল। পরে নিতাই বাবু—ইন্‌স্পেক্টর বাবুকে বাহিরে লইয়া গিয়া প্রায় ১৫ মিনিট ধরিয়া কি কথাবার্ত্তা কহিলেন। হাসিতে হাসিতে—দুইজনে যথাস্থানে আসিয়া উপবেশন করিলেন। ইন্‌স্পেক্টর বাবু করমচাঁদকে কহিলেন, "তুমি তোমার প্রাপ্য টাকা পাইলে মোকদ্দমা তুলিয়া লইতে প্রস্তুত আছ?"

করমচাঁদ সেলাম বাজাইয়া উত্তর দিল—"হুজুর! আমরা গরীব ব্যবসায়ী লোক,—টাকা পাইলে মোকদ্দমার প্রয়োজন কি?"

নিতাই বাবু চেক সহি করিয়া দিলেন। করমচাঁদ রসিদ দিল এবং ইন্‌স্পেক্টর বাবুকে লিখিয়া দিল—যে তাহার সাক্ষীসাবুদ নাই, সেই হেতু সে মামলা চালাইতে অক্ষম।

এদৃশ্যের এই স্থানেই উপসংহার হইল। নলিনী পুলিশের হাত হইতে অব্যাহতি পাইল। বাহিরে আসিয়া নিতাই বাবুকে জিজ্ঞাসা করিল "আমায় যে চারিহাজার টাকা দিবেন বলিয়াছেন—তাহা কখন পাইব?" নিতাই বাবু উত্তর করিলেন "কাল আমার আপিসে বেলা দশটার পর তুমি আসিও; পাকা লেখাপড়ায় সহি করিয়া চারিহাজার টাকা গ্রহণ করিও।"

সংসার নাটকের অভিনেতাগণ স্ব স্ব কার্য্য সমাধা করিয়া আপন আপন স্থানে প্রস্থান করিলেন। নলিনী বাড়ীতে আসিয়া বাহিরের ঘরে শুইয়া পড়িল, উপরে গেল না। সে উপরে আসুক না আসুক, বিপদ মুক্ত হইয়া গৃহে ফিরিয়াছে এইটুকুই যথেষ্ট—এই ভাবিয়া নলিনীর মাতা ও অভাগিনী দুর্গা নিশ্বাস ছাড়িয়া নিশ্চিন্ত হইল।

নলিনীর নিদ্রা হইল না,—সে একখানি পত্র লিখিতে বসিল। পরদিন বেলা দশটা বাজিতে না বাজিতে সে সেই পত্রখানি ভৃত্যের দ্বারা দুর্গার নিকট পাঠাইয়া দিয়া,—কাহাকেও কিছু না বলিয়া বরাবর নিতাই বাবুর আপিসে উপস্থিত হইল। তথায় দুই ঘণ্টা কাল অপেক্ষা করিয়া, পাকা লেখাপড়ায় সহি দিয়া, চারি হাজার টাকার নোট লইয়া—কি জানি কোথায় চলিয়া গেল।

এ দিকে নলিনীর পত্র—একবার—দুইবার—তিনবার—বারবার আকুল আগ্রহের সহিত দুর্গা পাঠ করিল। পত্রে এইরূপ লেখা ছিলঃ—

"দুর্গা!

তোমাকে বলিবার কিছুই নাই।—কেবল এইটুকু বলিবার আছে,—তোমার ন্যায় সর্ব্বগুণসম্পন্না সহধর্ম্মিনী লাভ বহুপুণ্যের ফল।

পূর্ব্বজন্মের সুকৃতিফলে সে শুভযোগ আমার ঘটিয়াছিল। কিন্তু চণ্ডালের কণ্ঠে মণিময় হার শোভা পাইবে কেন? ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে রত্ন পাইয়াও যত্ন করিতে পারিলাম না। বজ্রপশুর—দেবীপূজা কি করিয়া সম্ভব হয়! যতদিন না চরিত্র সংশোধন করিতে পারি, যতদিন না তোমার যোগ্য হইতে পারি, যতদিন না স্নেহময়ী জননীর চক্ষের জল ঘুচাইতে পারি, ততদিন কলঙ্কিত মুখ আর তোমাদিগকে দেখাইব না। আমি ভগবান রামকৃষ্ণ দেবের চরণ স্মরণ করিয়া তাঁহারই স্মৃতি-মন্দির আল্‌মোরা পর্ব্বতস্থ মঠে যাত্রা করিতেছি। চিন্তা করিও না,—অগ্নির সংযোগে অঙ্গারমালিন্য ধৌত হয়, পবিত্র সহবাসে আমারও প্রাণের ময়লা ছুটিয়া যাইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। মানুষের দ্বারা কাহারও কিছু হয় না; এই বার দেবতার পদে গিয়া আশ্রয় লইব। যদি জীবন স্রোত পরিবর্ত্তন করিতে পারি—তবেই আবার তোমাদের সম্মুখীন হইব, নচেৎ জানিও—তোমার পাপাত্মা স্বামীর—অকিঞ্চিৎকর অস্তিত্ব ধরা-বক্ষ হইতে মুছিয়া গিয়াছে। মাকে আমার প্রণাম জানাইয়া সব কথা খুলিয়া বলিও। অধিক লিখিতে পারিলাম না, হাত কাঁপিতেছে, প্রাণ কাঁপিতেছে, বুকের ভিতর ঝড় বহিয়া যাইতেছে!

হতভাগ্য—নলিনী।"

পত্র পাঠ করিয়া দুর্গা বহুক্ষণ ধরিয়া কাঁদিল,—ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান এক যোট হইয়া তাহার ভগ্নহৃদয়ে হর্ষবিষাদের—আশা নিরাশার—হাসিকান্নার নানা তরঙ্গ তুলিতে লাগিল। প্রথমে কাঁদিয়া শেষে দুর্গা বেশ করিয়া বুক বাঁধিয়া লইল; ভগবান রামকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে—বার বার প্রণাম করিয়া সে কাতরে বলিল—"ঠাকুর! স্বামী আমার—তোমার স্মৃতিমন্দিরে—তোমার পদাশ্রয় পাইবার আশায়—আমাদের মায়া মমতা বিসর্জ্জন দিয়া—বড় আশায় যাত্রা করিয়াছেন! দেখিও ঠাকুর! তোমার পতিতপাবন নামে যেন দাগ না পড়ে!"

কি আশ্চর্য্য! ওকি ও!! ক্রম্মহিত ভগবান রামকৃষ্ণের পট দুলিতে লাগিল, ঠাকুরের স্থির-গম্ভীর-উজ্জ্বল বদনে বালকের হাসি ফুটিয়া উঠিল! যে হাসির ফাঁসি পরিয়া মহাপাপী জগাই মাধাই উদ্ধার হইয়াছিল, একি সেই হাসি? দুর্গা স্পষ্ট শুনিল, ঠাকুর বলিতেছেন—'ভয় নাই মা! তোমার স্বামীকে আমি পায়ে ঠাঁই দিয়াছি তাহাকে লইয়া তুমি পরম সুখে দিন অতিবাহিত করিবে।'

দুর্গা উঠিয়া দাঁড়াইল; তাহার ক্ষীণ দেহযষ্ঠী থর-থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, মাথার ভিতরে যেন আগুণ জ্বলিতে লাগিল; তাহার মনে হইল—এ কি—সত্য কিম্বা প্রহেলিকা?

আমরা বলি,—শোন' দুর্গা! পাষণ্ডের পক্ষে প্রহেলিকা হইতে পারে, কিন্তু ভক্তের পক্ষে সত্য—সত্য—অতি সত্য!!

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

সেই দিন প্রভাতে হীরাবাইয়ের বাটী হইতে আসিয়া নিরুপমা শয্যায় শুইয়া পড়িল। সে ঘুমাইবার অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু পোড়া চোখে ঘুম কিছুতেই আসিল না। তাহার মনে হইল, কে যেন তাহার বুক খানা ভাঙ্গিয়া দিয়াছে! কে যেন তাহাকে রাবণের চিতার মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছে! কোথা দিয়া—কি হইয়া গেল—কেন হইল—কেমন করিয়া হইল? এমন প্রতারিত—সে জীবনে কখনও হয় নাই! এমন চোট সে আর কখনও খায় নাই! প্রথমে মনকে চোখ ঠারিবার চেষ্টা করিল; বুঝাইল,—'আমি বেশ্যা; আমার এ অনুশোচনায় প্রয়োজন কি? বারনারীর প্রাণে—পাপ পুণ্যের তরঙ্গ উঠে কেন?' কিন্তু না—মন তাহার বুঝিল না,—জলের রেখার ন্যায় এ ভাব তাহার

প্রাণের মধ্যে—অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না। প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা !! দারুণ জিঘাংসায় তাহার সর্ব্বশরীর ভরিয়া উঠিল। সে উঠিয়া বসিল; সারারাত্রির অত্যাচারে তাহার দুই চক্ষু দিয়া যেন স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছিল, মুক্তকেশরাশি ইতস্ততঃ ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, ব্যভিচার-ক্লিষ্ট মুখমণ্ডলে প্রতিহিংসার ছায়া পতিত হইয়া, বিকটা ডাকিনীর ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল। সে বহুক্ষণ ধরিয়া ভাবিয়া ভাবিয়া, মনে মনে কি একটা মতলব আঁটিল। দোয়াত কলম ও চিঠির কাগজ লইয়া সে একখানা পত্র লিখিতে বসিল। পত্র লেখা শেষ হইলে, চাকরকে ডাকিয়া চুপি চুপি কি বলিয়া দিল। অতঃপর জলভরা চৌবাচ্চায় নামিয়া সে দুই ঘন্টাকাল জলে পড়িয়া রহিল।

সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্ব্বেই সজনীকান্ত ফিটফাট্ বাবু সাজিয়া—হেরিল্লসমের সৌগন্ধে চারিদিক মাত করিয়া—আইভরির ছড়িটি ঘুরাইতে ঘুরাইতে—বাড়ী হইতে বহির্গত হইবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় নিরুপমার চাকর আসিয়া তাহাকে একখানি পত্র দিল। সজনী দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া পত্র পড়িতে লাগিল।

"স্বপ্নের ভালবাসা !

তোমায় কি বলিয়া সম্বোধন করিব—আমি অনেক ভাবিয়াও স্থির করিতে পারি নাই। কোথায়—কোন্ স্বপ্নের জগতে—কি সুখের স্বপ্নের ঘোরে তোমায় দেখিয়াছিলাম—তোমার কথা শুনিয়াছিলাম—তোমাতে—একান্তে মজিয়াছিলাম। সে স্বপ্নের ঘোর একরূপ কাটিয়া গিয়াছিল, আবার কেন নূতন স্বপ্ন দেখাইলে? আবার কেন আমাকে পাগল করিলে? আবার কেন আমাকে চরণের দাসী হইবার জন্য লালায়িত করিলে? আমি বেশ জানি—এ জীবনে তুমি আমার হইবে না—তোমায় কখনও 'সর্ব্বস্ব' বলিয়া হৃদয়ে ধরিতে পাইব না। আমার স্বপ্নের আশা—স্বপ্নের ভালবাসা—স্বপ্নেই শেষ হইবে। মনকে

অনেক করিয়া বুঝাইয়াছি, কিন্তু সে বুঝ মানে কই? সে আমার কথা শোনে কই? সে যে তোমাকে আর একবার দেখিবার জন্য আমার চুলের মুঠি ধরিয়া টানাটানি করিতেছে! এস আমার ইষ্টদেবতা—এস আমার ইহকাল পরকাল—এস আমার স্বপ্নের ভালবাসা! একটি বারের জন্য—আমায় দেখা দাও; জীবনে কখনও কাঁদি নাই, কান্নার ভার জানিতাম না। তোমার বাহাদুরী আছে—তুমি আমায় কাঁদাইয়াছ। কান্নায় কি সুখ আছে—তাহা শিখাইয়াছ। আমি আজ সন্ধ্যা হইতে—সারারাত্রি তোমার আশায়—জাগিয়া বসিয়া থাকিব। যদি না এস, যদি না দেখা দাও—কাল সকালেই শুনিবে—নিরুপমা—এ জগতে আর নাই!

পাগলিনী—নিরুপমা।"

দুইটি টাকা বখ্‌শিশ দিয়া সজনী চাকরকে বিদায় করিল। বলিয়া দিল—"বিবিকে বলিও, রাত্রি দশটার পর আমি যাইব।"

সজনী ভাবিতে লাগিল, "কেমন জব্দ করিয়াছি! যখন আমি সাধিয়াছিলাম—তখন আমার প্রস্তাব তুচ্ছ করিয়া উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল, এখন এক দিনের দেখাতেই যাদুকে কাঁদে ফেলিয়াছি! মেয়েমানুষকে কি করিয়া হস্তগত করিতে হয়—সে বিদ্যা বড় বেমালুম দখল করা গিয়াছে। এইবার নিরুপমা ছুঁড়ীকে লাট্টুর মতন ঘুরাইতে হইবে। বেটী আমার জন্য—পথে পথে ছুটিয়া বেড়াইবে—তবে আমার মনের ক্ষোভ মিটিবে।"

বিধাতার বিচিত্র রাজ্যের—বিচিত্র ব্যাপার! রাক্ষসী বলিতেছে—আমি মানুষের রক্ত খাইব,—মানুষ বলিতেছে—আমি রাক্ষসীকে বধ করিব। দেখা যাউক, এ যুদ্ধে কে জিতে—কে হারে!

তারপর সজনী গাড়ীতে উঠিয়া প্রিয় সহচর রামলালের বাটী অভিমুখে চলিল। মধ্যপথে রামলালের সহিত দেখা,—আর তত্দূর

কষ্ট করিয়া যাইতে হইল না। সজনী রামলালকে গাড়ীতে তুলিয়া লইল।

সজনী হাসিতে হাসিতে—নিরুপমার পত্রখানা রামলালকে পড়িতে দিল। চিঠি পড়িয়া রামলাল এরূপ বিকট হাস্যরবে রাজপথ মুখরিত করিয়া তুলিল, যে রাস্তায় অনেক লোক কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সজনীর গাড়ীর ভিতর উঁকি পাড়িতে লাগিল। পরে উভয় বন্ধুতে পরামর্শ করিয়া এই স্থির হইল, যে হীরাবাইকে বলা যাইবে—অদ্য রাত্রে কোনও আত্মীয়ের বাড়ী নিমন্ত্রণ উপলক্ষে যাইতে হইবে,—তথা হইতে ফিরিতে রাত্রি প্রায় দুইটা বাজিবে। রামলাল বলিল—"হীরাবাইকে আমি ঠিক ম্যানেজ্ করিয়া লইব, তাহার জন্য তোমাকে চিন্তিত হইতে হইবে না; তুমি বেটীর গুমোরটা আরও ভাল করিয়া ভাঙ্গিয়া দিয়া আইস—ইহাই আমার ইচ্ছা।"

অতঃপর উভয়ে হীরাবাইয়ের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইল। সেদিন অন্যান্য বন্ধুবান্ধবগণের শুভ পদার্পণে—হীরাবাইয়ের বাড়ী পবিত্র হয় নাই। রাত্রি সাড়ে নয়টা পর্য্যন্ত মদ্যপান, নৃত্যগীত, হাস্য-কৌতুকে অতিবাহিত করিয়া—আত্মীয়ভবনে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইতে হইবে বলিয়া—রামলালকে বসাইয়া রাখিয়া—সজনী গুপ্ত প্রেমাভিসারে প্রস্থান করিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, হীরাবাইয়ের উপর রামলালের একটু নেক্‌নজর ছিল, এবং হীরাবাইও তাহা জানিত। সজনী চলিয়া যাইবার পর রামলাল একটি পাত্র পূর্ণ করিয়া অল্প পরিমাণ সোডা মিশাইয়া ব্রাণ্ডি পান করিল। পূর্ব্ব হইতেই তাহার নেশার সুর একটু চড়িয়াছিল, এইবার সুর পঞ্চমে উঠিল। সে গদগদকণ্ঠে হীরাবাইকে বলিল—"দেখ হীরা! যদি কিছু মনে না কর ত' একটা কথা বলি! তোমাদের জাতের স্বধর্ম্ম দেখিতেছি, যে তোমাদের চায় না, তাহাকেই তোমরা চাও।"

ঈষৎ মৃদু হাস্যের সহিত হীরা উত্তর দিল—"এ কথা কেন বলিতেছ রামলাল বাবু?"

রামলাল। বলিতেছি সাধে? তুমি যদি আমার হইতে, এ সংসার কি সুখের হইত! কপোত—কপোতীর মত মুখোমুখী করিয়া দুজনে এ জীবনটা কাটাইয়া দিতে পারিতাম। আর তুমি কি মনে কর আমি একেবারে নিঃসম্বল? তোমায় খাওয়াইতে পরাইতে পারি—আমার কি এমন সংস্থান নাই? আমার মুখে লাগাম লাগাইয়া চিরজন্ম যে ঘোড়ার ন্যায় হাঁকাইয়া বেড়াইতে পারিতে! তা ভাই! তোমরাত' তা চাও না! যাহারা পাঁচ ফুলের মধু খুঁজিয়া বেড়ায়—একটাকে লইয়া যাহাদের প্রাণ পূর্ণ হয় না—তোমাদের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করা যাহারা ধর্ম্ম বলিয়া বিবেচনা করে—তাহাদেরই তোমরা চরণের দাসী।

হীরা।—এ কথার অর্থ কিছু বুঝিলাম না রামলাল বাবু!

রামলাল। অর্থ আর কি বুঝিবে মাথামুণ্ড! সজনীটিকে কি ঠাওরাও তুমি? সে তোমায় একটুও ভালবাসে না। বড়লোকের পাঁচটা আসবাব থাকে,—তুমিও সেই পাঁচটা আসবাবের ভিতর একটা। আমি জানি, তুমি সত্যনারায়ণকে মান, তাঁহার শপথ করিয়া বল—আমি যাহা প্রকাশ করিব, তাহা তুমি মনের ভিতর কুলুপ আঁটিয়া রাখিয়া দিবে?

হীরা। কি বলিবে—কাহার কথা?

রামলাল। সজনীর কথা। নিরুপমাকে লইয়া কি ব্যাপার হইয়াছে এবং হইতেছে—সমস্তই আমি তোমাকে খুলিয়া বলিব।

হীরা একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে ব্যস্ত হইয়া বলিল—"রামলালবাবু! আমাকে একটু মদ দাও।"

রামলাল হীরাকে সুরাপান করাইল।

এইবার হীরা বলিল—"আমি সত্যনারায়ণের দিব্য করিয়া বলিতেছি—তুমি যাহা বলিবে—এ জীবনে কখনও কাহারও কাছে প্রকাশ করিব না।"

রামলাল বলিল—"তবে শোন',—কালরাত্রে কি মতলবে নিরুপমাকে এখানে আনা হইয়াছিল—তাহা জান? তোমাকে বেশী মদ খাওয়াইয়া অজ্ঞান করিয়া ফেলা হইয়াছিল কেন জান? থাক্, সে কথায় আর আবশ্যক নাই। আজ নিমন্ত্রণের ভাণ করিয়া সজনী কোথায় গিয়াছে জান?"

হীরা। কোথায়?

রামলাল। নিরুপমার বাড়ী?

হীরা। মিথ্যা কথা!

রামলাল। মিথ্যা সত্য প্রমাণ লইতে চাও?

হীরা। চাই।

রামলাল। যদি সত্য বলিয়া প্রমাণ দিতে পারি—তাহা হইলে কি হইবে?

হীরা। তাহা হইলে—আমি তোমার হইব।

রামলাল। ধর্ম্মতঃ বলিতেছ?

হীরা। ধর্ম্মতঃ বলিতেছি।

রামলাল। তবে একখানা গাড়ী ডাকাও—আমার সঙ্গে চল। নিরুপমার বাড়ীর কাছেই এমন ভাবে গাড়ী রাখিব—যাহাতে সজনী তাহার বাড়ী হইতে বাহির হইলেই—তুমি দেখিতে পাও।

হীরাবাই উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তাহার বুকের ভিতর কে যেন আগুণ জ্বালিয়া দিল! সে দ্রুত উঠিয়া গৃহমধ্যে ঘন ঘন পদচারণা করিতে লাগিল।

পাঠক! ইহাকে কি বল? প্রেম—না স্বার্থপরতা? পিপাসা—না প্রতিহিংসা? ভালবাসা—না মোহের বিকার?

হীরা উচ্চৈঃস্বরে চাকরকে ডাকিয়া গাড়ী আনিতে বলিল। অতি নিকটেই গাড়ীর আড্ডা,—দশ মিনিটের মধ্যেই—গাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। রামলাল ও হীরাবাই গাড়ীতে উঠিল। ভৃত্য জিজ্ঞাসা করিল—"কোথায় যাইতেছেন?" হীরাবাই উত্তর দিল—"তোর সে কৈফিয়তে প্রয়োজন কি?"

তখন রাত্রি বারোটা বাজিয়া গিয়াছে। মহানগরী কলিকাতা একেবারে নিস্তব্ধ না হইলেও, রাজপথে লোক চলাচল বড় বেশী ছিল না। পানওয়ালার দোকানে গীত-বাদ্য ও মধ্যে মধ্যে পাহারাওয়ালার "খবর আচ্ছা হ্যায় হুজুর" ব্যতীত আর বিশেষ কিছু শোনা যাইতেছিল না। গাড়ী আসিয়া নিরুপমার বাটীর সন্নিকটস্থ হইল উপযুক্ত স্থানে রামলাল গাড়ী থামাইল। গাড়োয়ানকে বলিল—"বাতি নিবাইয়া দাও।" তৎক্ষণাৎ আদেশ প্রতিপালিত হইল।

গাড়ীর ভিতর বসিয়া বসিয়া প্রায় এক ঘণ্টা কাটিয়া গেল। হীরাবাই অধৈর্য্য হইয়া উঠিল। রামলালের প্রেমপূর্ণ স্তুতিবাদ তাহার ভাল লাগিতেছিল না। আট দশটি সিগারেটের আদ্যশ্রাদ্ধ করিয়া হীরাবাই বলিয়া উঠিল,—"রামলাল বাবু! তুমি মিথ্যাবাদী।"

হীরার কথা শেষ হইতে না হইতে নিরুপমার বাটীর প্রবেশ দ্বার উন্মুক্ত হইল। রামলাল হীরাকে দেখাইল,—একটি হ্যারিকেন্ ল্যাম্প হস্তে লইয়া নিরুপমা দ্বারদেশে দণ্ডায়মানা,—সজনী ধীরে ধীরে নিরুপমার বাটীর প্রবেশ দ্বার অতিক্রম করিয়া রাজপথে পা দিতেছে!

হীরা চীৎকার করিবার উদ্যোগ করিল;—রামলাল জোর করিয়া তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল। হীরা রামলালের বুকে মাথা রাখিয়া ঘন ঘন হতাশের দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া বলিয়া উঠিল,—"রামলাল বাবু!

আজ হইতে আমি তোমার। আমায় কোথায় লইয়া যাইবে চল ;—আমি আর সে বাড়ীতে এ জন্মে প্রবেশ করিব না।"

রামলাল বলিল,—"তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি একেবারে লোপ পাইয়াছে! তোমার গহনা পত্র টাকা কড়ি সব সেখানে পড়িয়া রহিল, আর তুমি সজনীর প্রেমে উন্মত্ত হইয়া—পথের ভিখারিণী হইতে চলিলে! সেই বহুমূল্য অলঙ্কার গুলি নিরুপমার দেহের শোভা বৃদ্ধি করিবে—তুমি কি এই চাও? সজনী তোমার বাড়ীতে আজ আর ফিরিবে না, এ কথা নিশ্চয়। এই সুযোগে তোমার যাহা কিছু আছে—সমস্ত লইয়া ভোরের গাড়ীতেই পশ্চিম রওনা হই।"

হীরাবাই একবার ভবিষ্যৎ ভাবিল, বুঝিল—এ যুক্তি মন্দ নয়। উত্তর দিল—"ভাল—তাই চল।"

গাড়োয়ান বাতি জ্বালাইয়া গন্তব্য স্থান অভিমুখে ঘোড়া ছুটাইল।

এদিকে—নিরুপমার বাটী হইতে বাহির হইয়া সজনীর প্রাণে নানা তরঙ্গের উদয় হইতে লাগিল। সে বিশেষরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিল—"এক বার হীরাবাইকে দর্শন দিয়া গেলে, সে আর কোন' সন্দেহ করিবে না।"

হীরাবাই ও রামলাল পৌঁছিবার পূর্ব্বেই সে হীরার বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল—সদর দরজা খোলা! আশ্চর্য্য হইয়া চাকরকে জিজ্ঞাসা করিল—"বিবি কোথায়?"

ভৃত্য উত্তর দিল—"রামলাল বাবুর সহিত ভাড়াটিয়া গাড়ী করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে।"

সজনী ক্রোধে অন্ধ হইয়া আত্মজ্ঞানশূন্য হইল। কাঁচের আলমারির ভিতর মদের বোতল রক্ষিত ছিল, চাবির অভাবে হাত দিয়া কাচ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া বোতল বাহির করিল; কাঁচে হাত কাটিয়া রক্তের স্রোত বহিতে লাগিল। উপর্য্যুপরি দুই গ্লাস সুরা পান করিয়া সজনী উন্মত্তবৎ হইয়া উঠিল! ভৃত্যকে ডাকিয়া—বজ্র-গম্ভীর স্বরে আদেশ

করিল—"ছাদের উপর গিয়া বসিয়া থাক,—কেহ ডাকিলে উত্তর দিস্ না।" ভৃত্য ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া ছাদের উপর গিয়া চুপটি করিয়া শুইয়া রহিল।

ঠিক এই সময় একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ী দরজার সম্মুখে উপস্থিত হইল। সুরা পানোন্মত্ত রামলাল এবং মদিরা ও প্রতিহিংসাচ্ছন্ন হীরা-বাই গাড়ী হইতে নামিয়া উভয়েই উভয়ের গলা জড়াজড়ি করিয়া শয়ন গৃহে প্রবেশ করিল। সম্মুখেই কালান্তক যম! এ রাত্রে সজনী আবার কেমন করিয়া আসিল? এ কি সত্য সজনী—না তাহার প্রেত-মূর্ত্তি? ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় সজনী লম্ফ দিয়া হীরার কণ্ঠ ধারণ করিল। রামলাল সিঁড়ি দিয়া গড়াইতে গড়াইতে কোনও রূপে প্রাণ বাঁচাইয়া সদর রাস্তায় গিয়া পড়িল! সজনী কোন' কথা কহিল না, কোন' কথা জিজ্ঞাসা করিল না, কোন' কথা শুনিবার অপেক্ষা করিল না। হীরা-বাইয়ের গলা টিপিয়া ধরিয়া—জোর করিয়া মাটীতে ফেলিয়া দিয়া—বুকে ও মুখে বার বার পদাঘাত করিতে লাগিল! হীরা বাইয়ের কাতর করুণ কণ্ঠস্বর ও চীৎকার—সেই দ্বিপ্রহর রজনীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া পরতে-পরতে উঠিয়া-উঠিয়া—নক্ষত্র খচিত আকাশের কোলে মিশাইয়া যাইতে লাগিল। হীরা বাইয়ের মুখ দিয়া ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠিল,—তথাপি বিরাম নাই,—তখনও পদাঘাত সমভাবে চলি-তেছে। এইবার হীরাবাই সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িল!

ইতিপূর্ব্বেই রামলাল গিয়া পুলিসে খবর দিয়াছিল,—অমুক বাড়ীতে খুন হইয়াছে। দেখিতে দেখিতে পুলিস-ইন্‌স্পেক্টর, জমাদার ও পাহারাওয়ালা আসিয়া বাড়ী ঘেরাও করিয়া ফেলিল। হীরা বাই-য়ের সংজ্ঞাহীন অর্দ্ধ মৃতদেহ হাসপাতালে চালান দিল। হাতে হাত-কড়ি দিয়া সাব্রিবদ্ধ হইয়া সজনীকে থানায় লইয়া চলিল!!!

পাঠক! এইবার বলুন,—জিতিল কে? সজনী—না নিরুপমা?

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

পাঠক! আমরা বহুদিন ক্ষিতীশ চন্দ্রের সংবাদ লই নাই,—আজ একবার তাঁহার খবরাখবর লওয়া যাক, চলুন।

ক্ষিতীশ চন্দ্রের বাটীতে আজ মহাধুম,—তাহার কন্যার বিবাহ; অন্নপূর্ণার প্রাণে আজ আনন্দ ধরে না, তাহার উপযুক্ত অবিবাহিতা দুহিতা যে সৎপাত্রে সমর্পিত হইবে, এ আশা তাহার আদৌ ছিল না। তাহার গুণধর স্বামীর উচ্চপ্রকৃতি ও প্রবৃত্তির গুণে অন্নপূর্ণার এরূপ ধারণা জন্মিয়াছিল, সুতরাং এ বিষয়ে আমরা তাহাকে বিশেষ দোষ দিতে পারি না!

ভাড়াটিয়া বাড়ীটি যথাসম্ভব সুসজ্জিত করা হইয়াছে; যে অপরিষ্কার প্রাঙ্গণে কখনও একটা আলো পড়ে নাই—সেই উঠান আজ উজ্জ্বল আলোকমালায় সুশোভিত হইয়া, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গের চিত্তবিনোদন করিতেছিল। মধ্যস্থলে কারুকার্য্যমণ্ডিত মখমলের আসনে বর উপবিষ্ট, বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রী বালকগণের মধ্যে তর্কবিতর্ক চলিতেছে,—ছাদের উপর এক পংক্তি লোক ভোজনে বসিয়াছে,—"লুচি আন"—"আলুর দম আন"—"ক্ষীর চাই,"—"দই চাই—দরবেশ চাই"—ইত্যাদি রবে দ্বিতল মুখরিত হইতেছে; ক্ষিতীশচন্দ্র আজ বড়ই ব্যস্ত।

বর কে, বরের পিতা কে, কোথায় বাড়ী, কি কাজ কর্ম্ম করে, এ সকলের বিস্তৃত পরিচয় প্রদান অনাবশ্যক, কারণ উহাদের সহিত আমাদের আখ্যায়িকার কোন সম্বন্ধ নাই। কেবল মাত্র এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে, যে বরের পিতা অবস্থাপন্ন ব্যক্তি নহেন, সুতরাং পয়সার বড়ই খাঁই! পাঁচশত টাকা নগদ, আটভরির চুড়ি, ছয় ভরির বালা, ও ছয় ভরির গলার হেঁসোহার কন্যার জন্য ক্ষিতীশকে দিতে হইবে, এই সর্ত্তে বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল।

এখন কথা হইতেছে,—ক্ষিতীশ এ সকল অর্থের সঙ্কুলান করিল কোথা হইতে? বলা বাহুল্য, চন্দ্রা এই বিবাহের ব্যয়ের সমস্ত টাকা সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিল। সে আপনার অমায়িক ব্যবহার ও সরলতার গুণে,এবং সঙ্গে সঙ্গে আপনার বিদ্যার প্রভাবে, অনেক ভদ্রমহিলার প্রিয়পাত্রী হইয়াছিল। সে দ্বারে দ্বারে গিয়া, আপনার নিকট-আত্মীয়ের কন্যাদায় জানাইয়া, প্রয়োজন মত অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিল। চন্দ্রার প্রতি সহানুভূতি করিয়া, সকলেই মুক্তহস্তে তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছিলেন। কিছু টাকার অপ্রতুল হওয়ায়, সে তাহার স্বোপার্জ্জিত অর্থ হইতে সে অভাব পূর্ণ করিয়াছিল। অন্নপূর্ণা সকল কথাই জানিত; সে যখন নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের জন্য তরকারি কুটিতেছিল, ময়দা মাখিতেছিল,তখন এক একবার লজ্জা ও ঘৃণায় তাহার বুকখানা কাটিয়া যাইতেছিল; সে ভাবিতেছিল, "একটা বেশ্যার সাহায্য লইয়া তবে আমার কন্যার বিবাহ হইতেছে; ভগবান! ইচ্ছাময় তুমি, তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কে দাঁড়াইবে? কিঙ্করীর এই মাত্র প্রার্থনা যেন আমার অভাগিনী কন্যা সুখী হয়!"

এইবার কন্যাসম্প্রদানের সময় উপস্থিত হইল, ক্ষিতীশ সমাদরে বরকে দালানের উপর লইয়া গেল। চন্দনে ও চেলীর জোড়ে ভূষিতা টুকটুকে শিষ্ট মিষ্ট নোলক নাকে মেয়েটী সম্প্রদানের স্থলে নীতা হইল। এমন সময় বরকর্ত্তা ক্ষিতীশকে বলিলেন, "বেই মশায়, টাকাটা এই সময়" ক্ষিতীশ বুঝিল; বলিল "সে জন্য চিন্তা কি, বেই মশায়, টাকা এইখানে মজুত আছে, গণিয়া লউন"—সত্য সত্যই সম্প্রদানের দান সামগ্রীর পার্শ্বেই একটি থালায় পাঁচশত টাকা ঢালা ছিল। হরি, হরি, সে টাকা কোথায় গেল? কে লইল? চুরি হইল না কি?।

থালা শুদ্ধ সে টাকা অদৃশ্য হইয়াছে। দুর্ভাগ্য ক্ষিতীশ!

বরকর্ত্তা চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "জুয়াচুরি জুয়াচুরি—জুয়াচোরের মেয়ের সহিত আমার ছেলের বিবাহ কখনই দিব না।" চারিদিকে কোলাহল উত্থিত হইল, সাধে বিষাদ ঘটিল, বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রীগণ, কৌতূহলপরবশ হইয়া ঘটনাস্থলে আসিয়া একত্রিত হইল। ক্ষিতীশ নির্ব্বাক নিস্পন্দ, হতাশের করাল ছায়ায় মুখমণ্ডল আবৃত। কেহ বলিলেন "চোর ধরিতেই হইবে"। কেহ বলিলেন, "পুলিসে খবর দেওয়া হোক্" আবার অস্ফুটস্বরে কে যেন বলিল, "ও সব চালাকি! চোখের উপর থেকে টাকাটা উড়ে যায়—একি একটা কথা! তবে যদি এখানে হোসেন খাঁ উপস্থিত থাকে ত বলিতে পারি না!"

ভালমন্দ পাঁচরকম লোকে, পাঁচরকম মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিল। ক্ষিতীশ বধির,—তাহার কাণে সে সকল কথা স্থান পাইতে ছিল না; সে মনে মনে বলিতেছিল, "পৃথিবী দ্বিধা হও, আমি তোমার কোলে আশ্রয় লই।" এই ভাবে একঘণ্টা কাল কাটিয়া গেল। এইবার বরকর্ত্তা মহা রাগত হইয়া বলিলেন, "আর আমি অপেক্ষা করিতে পারি না, বর লইয়া চলিলাম।" অন্তঃপুর হইতে ক্রন্দনের মুহুরোল শোনা যাইতে লাগিল।

এমন সময় একজন প্রিয়দর্শন মাড়োয়ারি যুবক আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল। তাহার মাথার টুপিটী, গায়ের বেলদার পাঞ্জাবিটি, বুকে বাঁধা বেণারসী চাদরখানি, পায়ের লপেটা জুতাজোড়াটি বেশ সুন্দর মানাইয়াছিল। সুন্দর দেখিলে কে না তাহার দিকে আকৃষ্ট হয়? নবাগত মাড়োয়ারী যুবকের মুখের পানে সকলেই চাহিয়া দেখিতে লাগিল। সে কাহারও সহিত কথা না কহিয়া ক্ষিতীশকে ডাকিয়া লইয়া একটু নির্জ্জনে গিয়া বলিল, "ক্ষিতীশ! আমার ছদ্মবেশ বোধ হয় তোমার চক্ষুকে প্রতারিত করিতে পারে নাই।

তোমার কন্যার শুভ বিবাহ কার্য্য সুশৃঙ্খলে সম্পন্ন হইতেছে কি না—এ সংবাদ লইবার জন্য আমি লোক নিযুক্ত রাখিয়াছিলাম। তাহারই মুখে শুনিলাম, দানের পাঁচশত টাকা চুরি গিয়াছে,—বরকর্ত্তা বর লইয়া চলিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত। এ খবর পাইয়া আমি ছুটিয়া আসিয়াছি। এই লও পাঁচ শত টাকা। চিন্তা করিও না, শীঘ্র গিয়া কন্যাদায় হইতে মুক্ত হও।"

বলা বাহুল্য ছদ্মবেশী মাড়োয়ারী যুবক আমাদের চন্দ্রা।

ক্ষিতীশ আনন্দে ও বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া বলিয়া উঠিল, "চন্দ্রা! তুমি কি দেবী?"

চন্দ্রা হাসিয়া উত্তর দিল, "ক্ষিতীশ! আমি দেবী নই, আমি পিশাচী। আমি আমার কর্ত্তব্য শেষ করিয়া তোমার নিকট বিদায় লইতে আসিয়াছি।"

ক্ষিতীশ এ কথার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিল না। চন্দ্রার চন্দ্রমা-লাঞ্ছিত চন্দ্রবদন ক্ষণকাল ধরিয়া তাকাইয়া তাকাইয়া দেখিতে লাগিল। চন্দ্রা কহিল, "আমার কথা বুঝিতে পারিতেছ না? এতদিন তোমার সহিত আমার যে সম্বন্ধ ছিল তাহা আজ ঘুচিয়া গেল। তুমি সংসারী, তোমার স্ত্রী সতী সাধ্বী, পূর্ব্বজন্মে বহু পুণ্যফলে অমন সহধর্ম্মিণী লাভ করিয়াছ। যদি মঙ্গল চাও, যদি আপনার ইষ্ট কামনা কর, তাহা হইলে তাহার প্রাণে আর ব্যথা দিও না। আমি আর তোমার পথের কণ্টক হইব না।"

বিনা মেঘে মাথায় বজ্রাঘাত পড়িলে মানুষ যেরূপ হইয়া যায়, ক্ষিতীশের অবস্থা ঠিক তাহাই হইল। সে কাঁপিতে কাঁপিতে কাঁদিতে কাঁদিতে চন্দ্রার পদতলে পতিত হইল। চন্দ্রা তাহাকে তুলিয়া ধরিয়া দাঁড় করাইল।

রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত প্রায়। আকাশে সপ্তমীর চাঁদ ক্ষীণ জ্যোতিঃ

ছড়াইতেছিল; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডমেঘ ভাসিয়া ভাসিয়া অনন্তের উদ্দেশে ছুটিয়া চলিয়াছিল। মিটী মিটী নক্ষত্র জ্বলিতেছিল! বসন্তের বায়ু ধীরে ধীরে বহিতেছিল। প্রকৃতি নীরব, ক্ষিতীশ নীরব, চন্দ্রা নীরব! পেচক বিকট স্বরে সে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া মূর্ত্তিমান পাপী ও পাপিনীর চৈতন্য সম্পাদন করিয়া পাক্‌সাট্‌ মারিয়া চলিয়া গেল।

ক্ষিতীশ বলিল, "আমার একটী কথার উত্তর দাও; তুমি এখন কি করিবে?"

চন্দ্রা অবিচলিত ভাবে উত্তর দিল, "আমার জন্য তুমি ভাবিও না, যে স্ত্রীলোক স্বামীর পদচ্যুত হইয়া একদিনের জন্যও অপর পুরুষের আশ্রয় লয়, তাহার আকাঙ্খা জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত অতৃপ্ত থাকে। নিত্য নূতনে আকিঞ্চন—তাহার জাতি ও ধর্ম্ম হইয়া দাঁড়ায়। মৃণালের সুতা যেমন যত টানা যায় ততই বাড়িয়া যায়, সেইরূপ চরিত্রহীনা রমণীর কুপ্রবৃত্তি দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে থাকে। আমি পাপের পথে পা দিয়াছি, শেষ কোথায়—একবার দেখিব। আমার সহিত আর তুমি সাক্ষাৎ করিও না। দ্রুতপদবিক্ষেপে চন্দ্রা সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।"

ক্ষিতীশ একবার আকাশের পানে চাহিয়া দেখিল—সপ্তমীর চন্দ্র মেঘে আবরিত;—তারপর আপনার মেঘভরা বুকের ভিতর উঁকি পাড়িল;—দেখিল বড় অন্ধকার! অমাবস্যার অন্ধকার তত মসীময় নহে; প্রলয়ের অন্ধকার তত ভয়াবহ নহে!

সে অন্নপূর্ণার মুখখানি একবার কল্পনার চক্ষে দেখিল; নিরাশ্রয় সন্তান সন্ততির তমসাচ্ছন্ন ভবিষ্যৎ মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিল; আত্মজীবনের ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান দিব্যচক্ষে প্রত্যক্ষ করিল। কাতর প্রাণে শূন্য পানে চাহিয়া করুণ কণ্ঠে ডাকিল, "জগদীশ্বর! যে আমার নয়, যে আমাকে চাহে না, আমাকে লইয়া যাহার প্রাণ পূর্ণ

হয়না, আমি তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিব কেন? বন্ধুরূপী মহাশত্রু ডাক্তার অনঙ্গমোহনই চন্দ্রাকে হস্তগত করিয়াছে। তোমার মনে যাহা আছে তাহাই হউক। আমি আজ হইতে স্রোতের তৃণ হইলাম। বল দাও প্রভু! যেন মনস্থির করিতে পারি!" সমস্ত ভাবনা বিসর্জ্জন দিয়া, ক্ষিতীশ চন্দ্রাপ্রদত্ত পঞ্চাশ খানি দশটাকার নোট ভাল করিয়া গুণিয়া লইয়া সম্প্রদান স্থানে উপস্থিত হইল।

অতঃপর উদ্বাহক্রিয়া একরূপ নিরাপদে সম্পন্ন হইয়া গেল। অন্নপূর্ণা নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিল। ক্ষিতীশ আকাশ পাতাল ভাবিতে ভাবিতে শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিল। কিন্তু টাকাটা কে লইল বা কি প্রকারে অদৃশ্য হইল তাহার কোনও কিনারা হইল না।

(ক্রমশঃ)

বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস।

চতুর্থ প্রস্তাব।

এই প্রস্তাবের প্রথমাংশে আমরা নাট্যাভিনয় সমূহের চিরসহচর একতান-বাদন সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যুক্তিযুক্ত মনে করি। বহু প্রাচীন প্রথামত কি না, বলিতে পারি না, তবে ইংরাজি নাট্যাভিনয়ের নাটকাঙ্কের বিরামকালে একতান যন্ত্র-সঙ্গীত প্রায় সকল স্থানেই হইত ও কলিকাতায়ও হইয়াছিল, ইহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। এবং এ প্রদেশের সেই প্রথম নাট্য-সম্প্রদায় (বাগবাজারের বাবু নবীন চাঁদ বসু মহাশয়ের ভবনস্থিত সম্প্রদায়) অনুষ্ঠিত ১২৪১ সালের ইং ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের অভিনয় কথার ইতিহাসে আমরা জানিয়াছি (হিন্দু পাইওনিয়ার, ১৮৩৫। অক্টোবর সংখ্যায়) যে সেই

নাট্যাভিনয়ে নাটকাঙ্কের বিরামকালে ভারতীয় বাদ্য যন্ত্র সমূহের সমাবেশে একতান বাদন হইয়াছিল। সেতার, সারঙ্গ, বেহালা, পাখোয়াজ প্রভৃতি যন্ত্রের একতান বাদ্যে এ দেশে প্রথম স্বদেশী concert বা একতান বাদন প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। আমাদের দেশের সেই পুরাতন 'সানাই' সংযোগে 'রসুন চৌকি' সম্প্রদায় বহুকাল যাবৎ আনন্দ দান করিয়া আসিতেছে বটে, কিন্তু তাহাতে দুই চারি প্রকার ব্যতীত বহু বাদ্যযন্ত্রের একত্র সমাবেশ নাই। আর 'সানাই' বাঁশীই রসুন চৌকি'র প্রধান বাজনা, অন্যান্য গুলি তাহার সহকারী মাত্র। কিন্তু কনসার্ট বা একতান বাদন আয়োজনে প্রত্যেক যন্ত্রই স্বীয় প্রাধান্য সংস্থাপনে যত্নবান। যাক্ সে কথা। বাগবাজারের নবীন বাবুর নাট্য-সম্প্রদায়ের সহিত সংশ্লিষ্ট একতান বাদন সম্প্রদায়ের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যন্ত্রী বাবু ব্রজনাথ গোস্বামী (মুদ্রাকর প্রমাদে ইতিহাসের প্রথম প্রস্তাবে প্রমথনাথ গোস্বামী এইরূপ ছাপা হইয়াছে) মহাশয়। ইনি উৎকৃষ্ট বেহালা বাদক ছিলেন। এই সম্প্রদায়ের অন্যান্য যন্ত্রীগণও নাকি সকলেই ব্রাহ্মণ ছিলেন।

নবীন বাবুর বাটীর সেই একতান বাদন কথার পর অন্যান্য বহু নাট্যাভিনয়ের সংশ্লিষ্ট একতান বাদনের বিষয় বিশেষ কিছুই জানিতে পারি না। তবে ১৮৫৩।৫৪ খ্রীষ্টাব্দের সেই 'ওরিএণ্টাল থিয়েটার' যখন সেক্সপিয়ারের 'ওথেলো' 'মারচেণ্ট অফ্ ভিনিস্' প্রভৃতি ইংরাজী নাটকাভিনয়ে নিযুক্ত, তখন বাবু যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর (পরে স্যার্ মহারাজা) মহাশয়ই তাঁহাদিগকে পরামর্শ দেন যে ইংরাজি নাটকাভিনয়ের পরিবর্ত্তে দেশীয় নাটকের অভিনয় করা বিশেষ আবশ্যক এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় বাদ্যযন্ত্র সমূহের একত্র সমাবেশে স্বদেশী অরচেষ্ট্রা প্রতিষ্ঠা করাও প্রয়োজনীয়। এই পরামর্শ পাইয়া ইঁহারা রামনারায়ণের 'কুলীন-কুল-সর্ব্বস্ব' অভিনয় করেন। একথা ইতিপূর্ব্বে

জানাইয়াছি। কিন্তু এই অভিনয়ের সঙ্গে কোনও দেশীয় একতান বাদন হইয়াছিল কি না একথা জানা যায় না। জোড়াসাঁকোর সেই স্বনামখ্যাত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের বাটীর নাট্যাভিনয়ের দর্শক ও তাঁহার প্রতিবেশী বাবু যদুনাথ পাল মহাশয় নাকি ঐ সময় হইতে এক একতান বাদন সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। এবং তিনি কালীপ্রসন্ন বাবুর বাটীতেই নাকি এ বিষয়ের প্রথম অনুষ্ঠান উদ্যোগ করেন। কালী প্রসন্ন বাবুর বাটীতে ফোর্ট উইলিয়ামের বাদ্য (গোরার বাজনা) এক সময়ে নাট্যাভিনয়ের সহিত একতান বাদনের কার্য্য করিয়াছিল। যদুনাথ বাবুর এই সকল দেখিবার শুনিবার বিশেষ সুযোগ ঘটিয়াছিল; তবে ইনি ও সঙ্গীতশাস্ত্রবিশারদ সেই ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয়দ্বয় মিলিত হইয়া পাইকপাড়ার রাজাদিগের বেলগেছিয়া থিয়েটারের সহিত এক স্বদেশী যন্ত্র সমূহের একতান বাদন সম্প্রদায় গঠন করেন। শ্রদ্ধেয় যোগীন্দ্র বাবুর রচিত 'মাইকেল জীবনী'তে সন্নিবেশিত গৌরদাস বসাক মহাশয়ের 'মাইকেল স্মৃতি' (Reminiscences of Michael M. S. Dutta) পত্রে আমরা জানিতে পারি যে দেশীয় নাট্যাভিনয়ের আয়োজন বেলগেছিয়ার স্থায়ী নাট্যশালায় সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে "a native orchestra was organised. In the construction of this orchestra Khetter Mohun Gossain, a genius in music, and Babu Jadu Nath Paul had the principal hand.

The Gossain for the first time put into notation some of the native tunes and 'ragas', and thus created a native Band known as the Belgatchia Amateur Band, headed by Babu Jadu Nath Paul". বেলগেছিয়া থিয়েটারের সহিত পাইকপাড়ার রাজ-ভ্রাতৃদ্বয়ের সম্মানিত বন্ধু ও নাট্য-প্রেমিক বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয় যেমন ঘনিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট এই বাদন

সম্প্রদায়েও তিনি তেমনই যত্নে ও আগ্রহে যোগদান করিয়াছিলেন। ইঁহার সঙ্গীতানুরাগ সর্ব্বসাধারণের সুবিদিত এ কথা যতীন্দ্রমোহন-প্রসঙ্গে ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি। তবে একথা পুনরুত্থাপনের উদ্দেশ্য এই যে তিনি এই একতান-বাদন প্রতিষ্ঠার একজন অন্যতম প্রধান প্রবর্ত্তক, এই কথা বলা মাত্র।

বেলগেছিয়া থিয়েটারে 'রত্নাবলী' নাটকের শেষ অভিনয় রজনীতে (২৪শে কার্ত্তিক ১২৬৫ বা ১৯শে অক্টোবর ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দ) না কি এই একতান বাদন সম্প্রদায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

নাট্যাভিনয়ের মধ্যে নাটকীয় চরিত্র বিশেষের দ্বারা আবশ্যক বোধে যেমন নানা রসের গীত সুর তান লয়ে গীত হইয়া নাটকের উন্নতি সাধন করিত, যন্ত্রাদির একতানে ও গায়ক গায়িকারা কখনও সেতার কখন বা বীণা বাজাইয়া সঙ্গীত করিয়া দর্শকগণের মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন একথাও শুনা যায়।

ইতিপূর্ব্বে আমরা লিখিয়াছি যে আচার্য্য কেশবচন্দ্রের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত সেই সিন্দুরিয়া পটীর 'বিধবা বিবাহ' নাটকাভিনয়ের সঙ্গে অভিনেতাগণ ব্যতীত প্রসিদ্ধ গায়ক ও যন্ত্রীগণ যোগদান করিয়া গীত বাদ্যের সাহায্যে অভিনয়কে আরও চিত্তাকর্ষক করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে গায়ককুলচূড়া রাধিকাপ্রসাদ দত্ত ও সুকণ্ঠ ক্ষেত্রমোহন বসু মহাশয়ের নাম চিরপ্রসিদ্ধ। এই সম্প্রদায়স্থ অন্যতম গায়ক বাবু উমেশ চন্দ্র দত্তের নাম তত প্রসিদ্ধ নহে। যন্ত্রী পঞ্চানন মিত্র, গদাধর মিত্র, বেণীমাধব সোম ও রসিক চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি মহাশয়গণের নাম যথাস্থানে উল্লেখ করিয়াছি। তবে ইঁহারাও নাট্যের সঙ্গে কি নাটকীয় সঙ্গীতের সাহচর্য্যে কি একতান বাদন করিয়া নাট্যাভিনয়ের অঙ্গসৌষ্ঠব বর্দ্ধন করিয়াছিলেন বলিয়া এ স্থলে পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক নহে। ইহা ১২৬৭ সালের কথা।

পরে ১২৭১ সালের শোভাবাজার রাজবাটীর 'একেই কি বলে সভ্যতা' নাট্যসম্প্রদায় ও বাগবাজারের বাবু গোপাল চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সেই 'নল দময়ন্তী'র নাট্য সম্প্রদায়ের সঙ্গেও একতান বাদন প্রথা প্রচলিত ছিল; তবে এই সময়ে অনেকস্থলে অভিনেতাগণও নিজে নিজে যন্ত্রাদি বাজাইয়া ঐক্যতান বাদন কার্য্য চালাইয়াছেন, পৃথক সম্প্রদায়ের আবশ্যক করে নাই।

১২৭১ সালের শেষভাগে অর্থাৎ ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের প্রথমাংশে বাগবাজারের ৺ গোকুল চাঁদ মিত্রের (শ্রীশ্রী৺মদন মোহন জীয়ুর প্রতিষ্ঠাতা) বংশধর বাবু গিরিশচন্দ্র ও আনন্দ লাল মিত্র মহাশয়দ্বয়, যাঁহারা 'নল দময়ন্তী'র সম্প্রদায়ে অভিনয় ভূমিকাও গ্রহণ করিয়াছিলেন, এক একতান বাদন সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন। গিরীশ বাবু একজন উচ্চ সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তি। এই সম্প্রদায়ে বাগবাজারের দুইজন প্রসিদ্ধ নাট্যকলা বিশারদ বাবু নগেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (৫৭, রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীট নিবাসী ৺ গিরীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ২য় পুত্র) বাবু রাধামাধব কর (ডাক্তার দুর্গাদাস করের ২য় পুত্র) মহাশয়দ্বয় ও হিঙ্গুল খাঁ (ওরফে হেম বাবু) নামক জনৈক মুসলমান যুবক যোগদান করিয়াছিলেন।

১২৭২ সালে পাথুরিয়া ঘাটার প্রসিদ্ধ জমিদার বংশ ঠাকুর বাটীর নাট্য সম্প্রদায়ের সঙ্গেও সঙ্গীতপ্রেমিক যতীন্দ্রমোহন ও শৌরীন্দ্রমোহন ভ্রাতৃদ্বয়ের যত্নে একতান বাদনের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। সঙ্গীত শাস্ত্রজ্ঞ সেই ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয়ই এই দলের নেতা ছিলেন। এই সম্প্রদায়ে বেহালা ব্যতীত অন্য কোনও বিদেশীয় যন্ত্র নাকি বাজিত না। বাবু শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর (একণে রাজা) তখন হইতেই সঙ্গীত শাস্ত্র চর্চ্চায় বিশেষভাবে মনোনিবেশ করেন। অতি অল্প বয়স হইতেই তিনি নাটকাদি চর্চা করেন এবং ১৬ বৎসর বয়সের

সময় 'মুক্তাবলী' নামক নাটিকা ও পরে 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকের অনুবাদ প্রকাশ করেন। হিন্দু সঙ্গীতের পুনরুদ্ধার ও দেশে সঙ্গীতচর্চ্চা কি গীত বিভাগে কি বাদ্য বিভাগে, প্রসারিত করিতে দ্বিতীয় ব্যক্তি অতুলনীয় ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এবিষয়ে ইঁহার যত্ন, অধ্যবসায় ও অর্থব্যয় অনন্যসাধারণ। একতান বাদনসম্প্রদায়ের নেতৃস্থান লাভে ইঁনিই একমাত্র অধিকারী। এই সকল বিষয়ে অন্যূন পঞ্চাশ খানি গ্রন্থ রচনা করিয়া এই সঙ্গীত শাস্ত্র বিশারদ বীণাপাণির বরেণ্য সন্তান বাগ্দেবীর চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া সঙ্গীত রাজ্যে চির যশস্বী হইয়া আছেন। পৃথিবীতে এমন কোনও সভ্য রাজত্ব নাই যেখান হইতে এই সঙ্গীতজ্ঞ মহানুভবকে কোন না কোন-ও প্রকার সঙ্গীত বিষয়ক উচ্চ উপাধি দান করা হয় নাই। 'অক্সফোর্ড' ও 'ফিলাডেল্‌ফিয়ার' বিশ্ববিশ্রুত বিশ্ববিদ্যালয়দ্বয় এই মহাত্মাকে সঙ্গীত ডাক্তার (Doctor of Music) উপাধি দান করিয়াছেন। যথার্থই ইঁনিই একমাত্র "Doctor of Music" উপাধি পাইবার উপযুক্ত।*

---

* এই সঙ্গীত শাস্ত্র বিশারদের বিস্তৃত জীবন-কথার আলোচনা এখানে অসম্ভব বলিয়াই দুই চারি কথা মাত্র এখানে আমরা দিতেছি। ইংরাজি ও হিন্দুসঙ্গীত শাস্ত্রের নানা পুস্তকাদি সংগ্রহ তাহাদের আলোচনা ও আলোচনান্তে কার্য্যে পরিণত করিয়া নিজে সঙ্গীতজ্ঞ হওয়াই তাঁহার প্রধান কার্য্য। এবং সেই সঙ্গে দেশীয় সভ্য ও শিক্ষিত সমাজের সাহায্যের জন্য সঙ্গীত গ্রন্থাদি রচনা করা তাঁহার অন্যতম কার্য্য। ইনি ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে 'বঙ্গ সঙ্গীত বিদ্যালয়' স্থাপন করিয়া সঙ্গীত চর্চ্চার সুযোগ সুলভ করিয়া দেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে "Bengal academy of music" নামক সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন। এই সকল অনুষ্ঠানে তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল হিন্দুসঙ্গীতকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে স্থাপন করা। কনসার্ট বা একতান বাদনের জন্য ও সেই জন্য তিনি নানা গৎ notation প্রস্তুত করিয়া দেন। ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর সম্পাদিত 'যন্ত্র ক্ষেত্র দীপিকা'য় তাঁহার রচিত অনেক গৎ আছে। অলঙ্কার-শাস্ত্রোক্ত রসসমূহের জীবন্ত

১২৭২ সালের শেষভাগে চৈত্র মাসে, ইংরাজি ১৮৬৬ মার্চমাসে, বঙ্গগৌরব স্যার্ রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়দিগের পুরাতন বাটিতে পাখোয়াজ আচার্য্য কেশব চন্দ্র মিত্র (জজ মহোদয়ের ভ্রাতা) মহাশয়ের উদ্যোগে ও শিক্ষায় এক একতান বাদন সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হয়।

শুনা যায় বাগবাজারের পূর্ব্বল্লিখিত গিরীশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের একতান বাদনসম্প্রদায় ভবানীপুরের বিখ্যাত জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে এক সময় বাজনার কৃতীত্ব দেখাইয়া স্থানীয় সম্প্রদায় অপেক্ষা সুযশ অর্জ্জন করিয়াছিল।

শ্যামপুকুরের ব্রজনাথ দেব মহাশয়ও এক একতান বাদন সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন। এই ব্রজনাথ বাবু স্বয়ং একজন সঙ্গীত ও নাট্য কলানুরাগী ব্যক্তি বলিয়া তখনকারকালে বেশ পরিচিত ছিলেন। নটগুরু গিরিশচন্দ্র ইহাঁরই ভগিণীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ইঁহারই পুত্রদ্বয় বর্ত্তমান 'গ্রাণ্ড ন্যাশানেল থিয়েটারে'র সুযোগ্য অভিনেতা ও অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত চুনীলাল ও নিখিলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব।

স্বদেশীয় ও বিদেশীয় তারের ও তাঁতের যন্ত্রাদির সহিত পিকলোও ক্লারিওনেট বাঁশী বাজিত। জলতরঙ্গের বাটীও ছিল। শঙ্খ বাদ্যের সহিত সুর মিলান হইত। যেন বাদ্যযন্ত্র সমূহের 'জগ-খিচুড়ি' প্রস্তুত হইয়াছিল।

ব্যাখ্যা ইনিই ঠাকুর বাটীর সেই 'রসাবিষ্কার বুন্দক' অভিনয়ে প্রথম দেখান। প্রহেলিকা অভিনয় (charades) বা হিন্দু সঙ্গীতের ছয় রাগের জীবন্ত অভিনয় নাট্যমঞ্চে ইহাঁরই যত্নে প্রবর্ত্তিত হয়। সকল দেশের সঙ্গীত সম্প্রদায়ই ইঁহার মত ও পরামর্শ গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইঁনি সঙ্গীত শাস্ত্রের একজন authority এবং হিন্দু সঙ্গীতের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও 'সঙ্গীত-নায়ক' বলিয়া ইঁহার নাম চির সমুজ্জ্বল থাকিবে। উপাধিরাশিতে ইনি আপাদ মস্তক ভূষিত বলিলেও চলে। এত উপাধিও ও সম্মান প্রাপ্ত হওয়া কোনও ভারতবাসীর ভাগ্যে ঘটে নাই।

বাগবাজারের পূর্ব্বোক্ত গিরীশ বাবুর বাজনার দল হইতে পৃথক হইয়া বস্থপাড়ার সেই নগেন্দ্র বাবু ও রাধামাধব বাবু একত্রে নগেন্দ্র বাবুদিগের রামকান্ত বস্থর ষ্ট্রীটের বাটীতে এক বাজনার দল প্রতিষ্ঠা করেন। পূর্ব্বকথিত সেই মুসলমান যুবক হিঙ্গুলখাঁ ইঁহাদের সহিত যোগদান করেন। এই মুসলমান যুবক বাঙ্গালীদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া আজীবন বাঙ্গালীদের মত থাকিতেন। ইনি সঙ্গীতজ্ঞ ও উৎকৃষ্ট অভিনেতাও ছিলেন।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে শোভাবাজার রাজবাড়ীতে যে আবার Sovabazar Private Theatrical Society"পুনর্গঠিত হয় তাহাতেও বিশিষ্টভাবে এক একতান বাদনের উদ্যোগ ছিল! এই সম্প্রদায়ের বাবু রাজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু বরদাকান্ত মিত্র ও কুমার স্বরেন্দ্র কৃষ্ণ দেব প্রভৃতি কয়েকজন সঙ্গীতবিৎ একতান-বাদন বিভাগের নেতা ছিলেন।

এই ভাবে একতান বাদন ক্রমশঃ সাধারাণ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। কিন্তু অনেক শিক্ষিত ব্যক্তির দ্বারা যেমন ইহা প্রতিষ্ঠিত হইল ক্রমে কতকগুলি কর্ম্মবিহীন অকর্ম্মণ্য লোকেও concert party স্থাপন করিয়া কেবল মাত্র বাজনার আকৃড়া বা আড্ডায় পরিণত করিল। ফলতঃ স্বদেশীয় বাদ্যযন্ত্রের সমাবেশে ও একতান বাদ্যে ইতিপূর্ব্বে যে মনোহর শ্রুতিমধুর ভারতীয় একতান বাদনের প্রতিষ্ঠা হইতেছিল তাহা একে একে তিরোহিত হইয়া দেশীয় বিদেশীয় বাদ্যযন্ত্রাদির সমাবেশে এক নূতন concert বা একতান বাদন প্রতিষ্ঠিত হইল। তাই গৌরদাস বাবু বেলগেছিয়া থিয়েটারের সহিত সংযুক্ত একতান বাদনের কথা আলোচনায় লিখিয়াছেন ;—"It was expected that this Band which had won encomiums from unprejudiced and appreciative Europeans, naturally averse to Indian music, would continue to be the model for a pure

national Band ; but unfortunately the later pioneers of the Dramatic Art have introduced some European instruments, and made it a mongrel affair.

ইহার কয়েক বৎসর পরেই আমরা বঙ্গীয় নাট্যাভিনয়ের তৃতীয় যুগে আসিয়া পড়ি। কিন্তু প্রথম দুই যুগের কথা সংক্ষেপে এখানে চতুর্থ প্রস্তাবের দ্বিতীয়াংশে, বলা আবশ্যক মনে করিতেছি।

ইতি পূর্ব্বে আমরা জানাইয়াছি যে 'নাটুকে নারাণ' বা কবিকেশরী রামনারায়ণ তর্করত্ন মহাশয়ই বঙ্গীয় নাট্যাভিনয়ের প্রথম যুগের অধিষ্ঠাতা। রামনারায়ণের সেই 'কুলীন-কুলসর্ব্বস্ব' ১২৬৩ সালে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে চড়কডাঙ্গার নাট্যপ্রেমিক জয়রাম বসাকের বাটীতে প্রথম অভিনীত হইয়া নানাস্থলে অভিনীত হইতে থাকে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কুলীনকুল-সর্ব্বস্বের এই প্রথমাভিনয় * রজনীর অব্যবহিত পরেই, কেহ কেহ বলেন ঠিক পর দিবস রাত্রেই, সিমুলিয়ার ধনকুবের বাবু আশুতোষ দেবের বাটীতে রামনারায়ণের 'শকুন্তলা' মহাসমারোহে অভিনীত হয়। এখন কেবল মাত্র এই দুইখানি নাটকেরই অভিনয় নানা স্থানে চলিতে লাগিল।

ঐ ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চমাসেই ১২৬৩সালের চৈত্রে জোড়াসাঁকোর স্বনামখ্যাত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের বাটীতে রামনারায়ণের 'বেণী সংহার' নাটক অভিনীত হয়। তৎপরে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ৩১ শে জুলাই অর্থাৎ ১২৬৫ সালের ১৬ই শ্রাবণ পাইকপাড়ার রাজাদিগের বেলগেছিয়া থিয়েটারে (প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের

* ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে এই নাটকখানি চুঁচুড়ায় অভিনীত হইয়াছিল। বহুবর্ষপরে ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ১০ই জানুয়ারী 'কুলীনকুল-সর্ব্বস্ব' কলিকাতা পটলডাঙ্গার বাবু ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষালের বাটীতে স্থাপিত 'ভারত নাট্যমন্দির' নামক সম্প্রদায় কর্ত্তৃক অভিনীত হয়।

ভূতপূর্ব্ব বাগান বাটীতে) রামনারায়ণের 'রত্নাবলী' নাটক প্রথম অভিনীত হয়।†

পরে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ৬ই জানুয়ারি ১২৭২ সালের ২৩শে পৌষ স্বর্গীয় মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাটীর সেই নাট্যসম্প্রদায় কর্ত্তৃক তাঁহার রচিত 'বিদ্যাসুন্দর' নাটকের প্রথমাভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে তর্করত্নের 'যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল' অভিনীত হয়। ১২৭৩ সালের ২৩শে পৌষ, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ৫ই জানুয়ারি প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের বাটীতে সেই খ্যাতনামা নাট্যসম্প্রদায় রামনারায়ণের পারিতোষিক প্রদত্ত 'নবনাটক' অভিনয় করেন। তর্করত্নের 'ধর্ম্মবিজয়' নাটকখানিও তাঁহার নিজ বাসগ্রামের 'বঙ্গ নাট্যসমাজ' নামক তাঁহারই যত্নে প্রতিষ্ঠিত একনাট্য সম্প্রদায়কর্ত্তৃক অভিনীত হইয়াছিল। এই নাটক খানি এই সমাজের জন্যই লিখিত হয়। তাঁহারাই ইহার অভিনয় করিয়া প্রকাশ করেন। কবিকেশরী রামনারায়ণই বঙ্গীয় নাটকাবলী রচনা বিভাগে ও বঙ্গীয় নাট্যাভিনয়ের প্রথম যুগে সর্ব্বপ্রথম সাফল্য-লাভ করিয়াছেন, এই জন্যই তাঁহাকেই আমরা বঙ্গীয় নাট্যাভিনয় যুগারম্ভের প্রথম অধিষ্ঠাতা বলিতেছি। তাঁহার প্রত্যেক নাটকই তখনকার কালে এক একখানি (এখন কার ভাষায়) যুগান্তরকারী' নাটক।‡

কবিকেশরী রামনারায়ণের সমকালবর্ত্তী হইলেও তাঁহার প্রতিষ্ঠার পর মধুসূদনের প্রতিষ্ঠা। এই জন্য আমরা বলিতেছি দ্বিতীয় যুগের নাট্যকার কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয়। তাঁহার কথাও তাঁহার

† সাধারণ রঙ্গালয় মধ্যে বেঙ্গল থিয়েটার কর্ত্তৃক এই নাটকখানি ১৮৭৩ খৃঃ ২২শে নভেম্বর প্রথম অভিনীত হয়।

‡ সাধারণ নাট্যশালার মধ্যে ন্যাশানাল থিয়েটার কর্ত্তৃক এই প্রহসন খানি ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ৮ই মার্চ প্রথম অভিনীত হয়।

নাটক রচনার কথা তাঁহার জীবনবৃত্তকার শ্রদ্ধেয় যোগীন্দ্র বাবু 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত' গ্রন্থে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়া বঙ্গীয় পাঠক সমাজকে চিরঋণী করিয়া রাখিয়াছেন। মধুসূদনের কথা অতি সংক্ষেপে, কিন্তু সঠিক ও সহৃদয় ভাবে, সত্যের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, পণ্ডিতবর খ্যাতনামা গৌরদাস মহাশয় লিখিত 'স্মৃতি-রাশি' তেও স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ আছে। আমরা এস্থলে সেই দ্বিতীয় নাট্যরথি মধুসূদনের কথা ও তাঁহার নাটকাদির অভিনয়ের কথা কিছু কিছু জ্ঞাপন করিয়া চতুর্থ প্রস্তাবের শেষ করিব।

ইতি পূর্ব্বে আমরা জানাইয়াছি যে Belgatchia Theatre এ 'রত্নাবলী' নাটকের ইংরাজি অনুবাদ করার ভার মাইকেল মধুসূদন দত্তের উপর প্রদত্ত হয়। কবিবর মধুসূদন দত্তের নাট্যজীবনও এই অনুবাদের কার্য্যের সঙ্গেই আরম্ভ হইল। যোগীন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন ;—'রত্নাবলী' অভিনয়ের প্রশংসা সমস্ত দেশময় পরিব্যাপ্ত হইল। * * * এবং সেই সঙ্গে 'রত্নাবলীর' ইংরাজি অনুবাদকের নাম চতুর্দ্দিকে প্রসারিত হইল।" শুধু তাহাই নহে, এই অনুবাদ কার্য্যে মাইকেলের ন্যায় ইংরাজি শিক্ষিত পণ্ডিত নিযুক্ত হওয়ায় এরূপ আভাষ পাওয়া গেল যে 'এদেশে নাট্যশাস্ত্রের যদি কখনও পুনরুজ্জীবন হয়, তবে তাহা ইংরাজি শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের দ্বারাই হইবে।' এই অনুবাদ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া মধুসূদন ইহা বুঝিয়াছিলেন যে সংস্কৃত নাটকের অনুকরণে বাঙ্গালা নাটকাদি রচিত হইলে বাঙ্গালা নাটকের উন্নতি কখন সম্ভবপর নহে। এবং জাতীয় নাট্যশালার পুনরুদ্ধার জাতীয় সাহিত্য এবং সেই সঙ্গে জাতীয় জীবন উন্নয়নের একটি মহৎ অনুষ্ঠান, এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া 'রত্নাবলীর' অনুবাদের ভূমিকায় লিখিতেছেন ; 'The friends who wish that our countrymen should possess a literature of their own, a vigorous and inde-

pendent literature, and not a feeble echo of everything Sanskrit, will rejoice to hear that a taste for the Drama is beginning to develop itself rapidly among the higher classes of Hindu society.' রামনারায়ণের 'রত্নাবলীর' অনেক গুণ থাকিলেও মধুসূদনের নিকট ঐ রূপ নাটক ভাল বোধ হয় নাই। তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে কবি রামনারায়ণ 'রত্নাবলী' প্রণেতা কাশ্মীর রাজ শ্রীহর্ষদেবের নিকট ঋণী থাকিলেও 'he has engrafted much novel matter on the old stock and may fairly challenge the honor due to an original writer. (রত্নাবলীর ইংরাজি অনুবাদের ভূমিকা) তথাপিও তিনি গৌরদাস বাবুকে একদিন বলিয়াছিলেন ;—"What a pity, the Rajas should have spent such a lot of money on such a miserable play." ইংরাজি-নবীশ মধুর মনে সংস্কৃত আদর্শে বাঙ্গালা নাটক রচিত হওয়া একেবারেই উচিত নহে। এবং তিনি স্বয়ংই যে অন্য আদর্শে নাটকাদি লিখিতে সক্ষম, ঐ কার্য্যে শীঘ্র ব্রতী হইবেন তাহা বুঝিতে পারিয়া উক্ত ভূমিকায় লিখিয়া দিলেন যে—'I am fully convinced that the day is not far distant, when the frincely munificence of such patrons as the Rajas of Paikparah will call into the field a post of writers who will discard Sanskrit models and look to far higher sources for inspiration.' তাই তিনি বলিয়াছিলেন ;—'I wish I had known of it before, as I could have given you a piece worthy of your Theatre.' (গৌরদাস বাবুর 'মাইকেল স্মৃতি') যোগীন্দ্রবাবু বলেন,—'রত্নাবলীর' ইংরাজি অনুবাদ হইতে মধুসূদন তাঁহার জীবনের গন্তব্য পথ প্রাপ্ত হইলেন'। অর্থাৎ তাঁহার নাটক ও কাব্যাদি রচনা করিয়া অমর ও চিরযশস্বী হইবার সূচনা এই অনুবাদ হইতে আরম্ভ

হইল। তিনি বেলগেছিয়া থিয়েটার সংস্পর্শে আসিয়া নাট্যপ্রেমিক হইয়া নাটক রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন এবং স্বয়ং অভিনেতা না হইয়াও তৎকালীন সম্ভ্রান্ত নাট্য সম্প্রদায় মাত্রেরই সহিত সংযুক্ত থাকিয়া অভিনেতৃগণকে সুপরামর্শ দানে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। বঙ্গীয় নাট্যশালার সহিত মধুসূদন ঘনিষ্ট ভাবে সংবদ্ধ তাই তাঁহার কথা আমরা এখানে সবিস্তারে জানাইতে বাধ্য হইলাম।

বাবু ভোলানাথ চন্দ্র মহাশয় লিখিয়াছেন, Sagarika (Ratnavoli) was losing charm by repetition, when Modhu came to the rescue with his 'Sarmistha'.

মধুসূদনের প্রথম রচনা 'শর্ম্মিষ্ঠা' নাটক খানি ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে রচিত হইয়া ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর অর্থাৎ ১২৬৭ সালের ১৯ শে ভাদ্র পাইকপাড়ার রাজাদিগের বেলগেছিয়া থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়। এই অভিনয়েতিহাস ইতিপূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে। *

আর এক কথা, এই শর্ম্মিষ্ঠা নাটকখানি লইয়া "Bengal Theatre" (পরে Royal) ১২৮০ সালের ১লা ভাদ্র (ইং ১৮৭৩ খৃঃ ১৬ই আগষ্ট) প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই শর্ম্মিষ্ঠা নাটকখানি রচনা করিয়াই মধুসূদন বাঙ্গালাভাষার সুলেখক বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তাঁহার নাটকখানি সর্ব্বজন প্রশংসিত হওয়ায় ও সমসাময়িক পণ্ডিতমণ্ডলী একবাক্যে শর্ম্মিষ্ঠার শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করায় তাঁহার রত্নাবলীর অনুবাদের ভূমিকাস্থ ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইল। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' (৫ম পর্ব্ব ৫৮ সংখ্যা শক ১৭২০ মাঘ) লিখিয়াছেন, "আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, যে সকল বাঙ্গালা নাটক এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত

* বেলগেছিয়া থিয়েটারে বাবু (পরে মহারাজ বাহাদুর স্যার) ও বাবু (পরে রাজা) রাজেন্দ্রলাল মিত্র সভাসদরূপে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

হইয়াছে,তন্মধ্যে সাধারণ জনগণে শর্ম্মিষ্ঠাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিবেন সন্দেহ নাই।" (বিস্তারিত বিবরণ যোগীন্দ্র বাবুর মাইকেল জীবনীতে দেখুন)

শর্ম্মিষ্ঠা নাটক খানি অভিনীত হইবার অব্যবহিত পরেই মাইকেল 'একেই কি বলে সভ্যতা'? ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' নামক প্রহসনদ্বয় বেলগেছিয়া থিয়েটারে অভিনয় জন্যই রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু নানা কারণে বেলগেছিয়া থিয়েটারে এই প্রহসনদুইখানি অভিনীত হয় নাই। 'একেই কি বলে সভ্যতা?' সম্বন্ধে পণ্ডিতবর রামগতি ন্যায়-রত্ন মহাশয় বলেন;—"আমাদের বিবেচনায় এরূপ প্রকৃতির যতগুলি পুস্তক হইয়াছে তন্মধ্যে এইখানি সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে এই প্রহসনখানি শোভাবাজারের রাজা দেবীকৃষ্ণের রাজবাটীর নাট্য সম্প্রদায় কর্ত্তৃক প্রথম অভিনীত হয় (Shovabazar Private theatrical societyর বিবরণীতে ইতিপূর্ব্বে সবিস্তারে বিবৃত আছে) 'বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ' সর্ব্বপ্রথম সাধারণ রঙ্গালয়ে National Theater কর্ত্তৃক ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ৮ই মার্চ্চ অভিনীত হয়।

১৮৬০খৃষ্টাব্দে (আনুমানিক) মধুসূদনের 'পদ্মাবতী' নাটক রচিত হয়। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে শুঁড়িপাড়ার সাহাদিগের বাটীতে ও বটতলার ধনকুবের খ্যাতনামা জয়চাঁদ মিত্র মহাশয়ের পুত্র পঞ্চানন মিত্রের উদ্যোগে তাঁহাদের বটতলার বাটীতে মহাসমারোহে এই নাটকখানি অভিনীত হইয়াছিল।

তখনকার যুগে 'পদ্মাবতী' একখানি উৎকৃষ্ট নাটক। এই নাটক খানিতেই সর্ব্বপ্রথম 'অমিত্রাক্ষর' ছন্দঃ প্রবর্ত্তিত হয়। উত্তরকালে স্থায়ী নাট্যশালায় ১৮৭৪ খৃঃ ৪ঠা জুলাই এই নাটকখানি Bengal Theatre কর্ত্তৃক অভিনীত হয়। *

* উত্তরকালে মধুসূদন স্যান্যালের জোড়াসাঁকোর বাটীতে THE NATIONAL Theatre কর্ত্তৃক (১৮৭৩ খৃঃ ২২শে ফেব্রুয়ারি) এই নাটকও অভিনীত হইয়াছিল।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দেই মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক রচিত হয়। ঐ বৎসরের ৬ই আগষ্ট হইতে ৭ই সেপ্‌টেম্বর মধ্যে অর্থাৎ এক মাসকাল মধ্যেই এই নাটকখানি রচিত হইয়াছিল। শুনা যায় টডের 'রাজস্থান' হইতে আখ্যানভাগ গ্রহণ করিয়া বাবু কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের (নাট্যাচার্য্য) পরামর্শমত মধুসূদন এই নাটক প্রণয়ন করেন এবং ইহাঁরই নামে নাটকখানি উৎসর্গ করেন। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারি 'কৃষ্ণকুমারী' (Shovabazar Private Theatrical Society) শোভাবাজার রাজবাটীর নাট্যসম্প্রদায় কর্ত্তৃক প্রথম অভিনীত হয়। ১৮৬৫ হইতে দুই বৎসর' ধরিয়া ইহার মহলা চলিয়াছিল। ‡

এই খানে আমরা বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাসের যে পর্য্যন্ত আসিয়াছি তাহার সমসাময়িক একতানবাদন সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠার ও পরিপুষ্টির সংক্ষিপ্তবিবরণ ও সেই যুগের শ্রেষ্ঠ নাট্যকারদ্বয়ের সম্বন্ধে কিছু কিছু অত্যাবশ্যক কথা লিপিবদ্ধ করিয়া ইতিহাসের চতুর্থ প্রস্তাব শেষ করিলাম। পর প্রস্তাবে তৃতীয় নাট্যকারের নাট্যাভিনয় আরম্ভ ও যে যে সম্প্রদায় কর্ত্তৃক সেই সেই নাট্যাভিনয় প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল তাহাদের বিবরণ যথাযথ লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিব। (ক্রমশঃ)

নাট্যাচার্য্য গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ই অবৈতনিকভাবে বৈতনিক রঙ্গমঞ্চে এই কৃষ্ণকুমারীর শ্রেষ্ঠ ভূমিকা 'ভীম সিংহ' গ্রহণ করিয়াই অবতীর্ণ হয়েন ও যথাযোগ্য প্রশংসা প্রাপ্ত হন। বিস্তৃত বিবরণ যথাস্থানে পরে দ্রষ্টব্য।

‡ যোগীন্দ্র বাবু বলেন ;—"মধুসূদন পরে কৃষ্ণকুমারী নাটকে কুমারী কৃষ্ণার যে মনোহর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন, পদ্মাবতীতে তাহার প্রথম রেখাপাত হইয়াছে। নাটকীয় লক্ষণ অনুসারে বিচার করিলে পদ্মাবতী মধুসূদনের অপর দুইখানি নাটক (শর্ম্মিষ্ঠা ও কৃষ্ণকুমারী) অপেক্ষা নিকৃষ্ট ; কিন্তু তাহা হইলেও ইহা কুমারী কৃষ্ণা এবং শর্ম্মিষ্ঠার সহোদরা হইবার অযোগ্য নয়।

333

বাঙ্গলার রঙ্গালয়।

(শ্রীঅতুলচন্দ্র বসু বি, এল লিখিত)

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

আমাদের দেশে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা অতি অল্প। তাঁহাদের মধ্যে আবার অনেকেই কার্য্য বিভ্রাটে রঙ্গালয়ে যাইতে পারেন না। যাঁহারা সাধারণতঃ রঙ্গালয়ে যাতায়াত করেন, তাঁহাদের মধ্যে অল্পাংশই নাট্য-রসিক, অবশিষ্ট দর্শকগণ প্রায়ই দায়িত্ব-জ্ঞান-হীন, কেবল মাত্র উচ্ছৃঙ্খল আমোদে নিশাযাপন উদ্দেশ্যে রঙ্গালয়ে গমন করেন। এই দুই দল শ্রোতার মধ্যে কোন দলকেই রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষগণ ছাড়িতে পারেন না। প্রথম দল নাট্য রসিক—যাহা কিছু যশঃ খ্যাতির আশা রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষগণ প্রত্যাশা করেন, তাহা তাহাদিগের নিকটেই সম্ভব। অভিনেতা অভিনেত্রীগণ তাঁহাদের মুখাপেক্ষী হইয়াই স্ব স্ব অভিনয় চাতুর্য্য প্রদর্শন করেন। নাটককারগণ তাঁহাদের নিকট হইতেই প্রশংসামাল্য প্রত্যাশা করেন। তাহা হইলেও রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষগণ দ্বিতীয় দলকে ছাড়িতে পারেন না। কেননা তাঁহারাই পয়সা দেয়। প্রথম দলের সংখ্যা অতি অল্প। কেবল মাত্র তাঁহাদিগকে লইয়া ব্যবসায় চলে না, সেই জন্য দ্বিতীয় দলের মনস্তুষ্টির প্রয়োজন। প্রথম দল দেখিতে চান নাটকের পরিপুষ্টি, নাটকীয় চরিত্রের অভিব্যক্তি, নাটকীয় ঘটনাবলীর সঙ্গতি, অভিনেতার কলা-কৌশল, দৃশ্যপটের স্বাভাবিকত্ব। দ্বিতীয় দল চান প্রেমের সঙ্গীত, উদ্দাম নৃত্য, চটুল বাক্‌রহস্য, সজ্জার আড়ম্বর, দৃশ্যপটের চাকচিক্য। যে নাটকে এই সব উপাদান না থাকিবে, তাঁহারা সে অভিনয় দেখিবেন না, সে রঙ্গালয়ের ছায়াস্পর্শ করিবেন না। দ্বিতীয় দলের এই

রুচি বিভ্রাট সম্বন্ধে একটী অদ্ভুত ঘটনা নিম্নে বিবৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। তখন মিনার্ভা রঙ্গালয়ে মহা সমারোহে "শঙ্করাচার্য্যের" অভিনয় হইতেছিল। রঙ্গালয় দর্শকে পূর্ণ। আমাদের পশ্চাতে পিটের আসনে একদল পূর্ব্ববঙ্গীয় যুবক বসিয়া অভিনয় দেখিতেছিল। অভিনয় অতি সুন্দর—দক্ষ অভিনেতা অভিনেত্রীগণ প্রাণপণ পরিশ্রমে স্ব স্ব অভিনয়-চাতুর্য্য দেখাইতেছিলেন। তাঁহাদের সফলতায় নাট্যামোদী দর্শকবৃন্দ অস্ফুটকণ্ঠে প্রশংসাধ্বনি করিতেছিলেন। সকলে যখন অভিনয়ে তন্ময়, পূর্ব্ববঙ্গীয় ভ্রাতারা তখন পরস্পরের মধ্যে কোন অভিনেতার কি নাম, কোন অভিনেত্রীর কত বয়স, কোথায় বাসস্থান ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন। কিয়ৎক্ষণ অভিনয়ের পর নর্ত্তকীগণ নাচিতে আসিল। কলকণ্ঠে chorus এ গান ধরিল—

"ফুল কাননে
বুকে বুকে সুখে সুখে থাকি দুজনে।"

অমনি পূর্ব্ববঙ্গীয় ভ্রাতাদের হৃদয়ের রুদ্ধ কপাট খুলিয়া গেল, বাহাবা ধ্বনিতে রঙ্গালয় ভরিয়া উঠিল। তার পর নর্ত্তকীগণ যখন একত্রে সারি বান্ধিয়া নাচিতে নাচিতে রঙ্গমঞ্চের সম্মুখে আসিল, অমনি তাহার মধ্যে একজন সোল্লাসে বলিয়া উঠিল "চারী, আইছে, চারী আইছে, আই, বামপার্শ্বের ছুয়েরটী"। কথা শুনিয়া হাসিলাম, পূর্ব্ববঙ্গীয় ভ্রাতাদের নাট্যরসবোধের মাত্রা বুঝিয়া হাসিলাম, রঙ্গালয়ের দর্শকগণের অবস্থা বুঝিয়া হাসিলাম; ভাবিলাম ইহারা কি মানুষ! কিন্তু ইহারাই রঙ্গালয়ের সুদৃঢ় স্তম্ভ। ইহাদিগকে না হইলে রঙ্গালয় চলিবে না। নাটককার বোধ হয় তাই বুঝিয়া তাঁহার নীরস শঙ্করাচার্য্য চরিত্রে এই সকল গানগুলি জুড়িয়া দিয়াছিলেন। এই সব মহাপ্রভু দর্শকগণের জন্য নাটককারগণকে অনেক সময় বেগ পাইতে হয়। নাচ গান না হইলে ইহাদের ফুর্ত্তি জমেনা। তাই আমরা ভাল ভাল

নাটকে অনেক অসঙ্গত নৃত্যগীত দেখিতে পাই। ইঁহাদেরই মনস্তুষ্টির জন্য ভাল ভাল নাটকের সঙ্গে একটী করিয়া রঙ্গনাট্য বা হাস্যবহুল প্রহসন অভিনয় করিতে হয়। ফলতঃ ইহাঁরা রঙ্গালয়ের উৎসাহদাতা হইয়াও রঙ্গালয়ের অবনতির কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। ইহাঁদের হস্ত এড়াইতে রঙ্গালয়ের কর্তৃপক্ষগণকে এখন অনেক আয়াস স্বীকার করিতে হইবে।

শুধু আমাদের দেশ বলিয়া নহে, পৃথিবীর যত সভ্যজাতীয় রঙ্গালয়ের অবস্থাই এইরূপ। তবে সংখ্যায় কিছু কম বেশী। কিন্তু রঙ্গালয়ের অধিকাংশ দর্শকগণের অবস্থা এইরূপ শোচনীয় একথা শুনিয়া বিরুদ্ধবাদীরা বলিবেন—"তাহা হইলে রঙ্গালয় লোকশিক্ষা প্রদান করিল কই।" যদি অধিকাংশ দর্শকই নাটকের মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারিল না, তাহা হইলে রঙ্গালয় দেশের সমাজের উপকার কি করিল? এ প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদিত হয় বটে কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই ইহার সদুত্তর পাওয়া যায়।

শিক্ষা দুই প্রকারে হয়। এস, শিক্ষা কর, তোমাদিগকে শিক্ষা করিতেই হইবে, এই বলিয়া লোক ডাকিয়া শিক্ষা দান করা এক প্রকার; এই পদ্ধতিতে শিক্ষকের প্রাধান্য অতিশয়। যাহারা শিক্ষার্থী, তাহারাই ইহাতে ফললাভ করে। কিন্তু যাহারা "দুষ্ট ছেলে," শিক্ষায় যাহাদের মন নাই, যাহারা শিক্ষার জন্য এতটুকু কষ্ট, অল্প মাত্র আয়াস স্বীকারে প্রস্তুত নয়—আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য আমাদের দেশে এইরূপ লোকের সংখ্যাই অধিক—তাহারা ইহাতে কোন উপকারই পায় না। আর এক প্রকার শিক্ষার উপায় আছে যাহাতে লোক ডাকিতে হয় না, শিক্ষককে জলদগম্ভীরস্বরে তর্কপরম্পরা দ্বারা আলোচ্য মতের প্রাধান্য স্থাপন করিতে হয় না—এ শিক্ষা পদ্ধতি বিশুদ্ধ বায়ুর ন্যায় অজ্ঞাতে চিত্ত পুলকিত করে—হৃদয় সবল করে।

ইহাতে কষ্ট নাই, পরিশ্রম নাই, বিরক্তি নাই—উপরন্তু তৃপ্তি আছে, আনন্দ আছে। রঙ্গালয় এই উপায়ে জনসাধারণকে শিক্ষা দান করে—অজ্ঞাতে তাহাদের হৃদয় বিশুদ্ধ করে;—নাটকের আলোচ্য চরিত্র পরোক্ষ ভাবে দর্শকগণের হৃদয়ে প্রাধান্য লাভ করিয়া তাঁহাদের মনোবৃত্তি ও কার্য্যকারী শক্তিকে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলে। "সরলায়" শশীভূষণের অবস্থা, "প্রফুল্লে"—যোগেশ রমেশের অবস্থা, "বলিদানে" করুণাময়ের অবস্থা দেখিয়া কাহারও কি শিক্ষা লাভ হয় নাই। অবশ্য ইহার ব্যক্তিগত উদাহরণ দেওয়া অসম্ভব কিন্তু যাঁহারা রঙ্গালয়ে উক্ত নাটকাবলীর অভিনয় দেখিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে এমন পাষাণ কেহই নাই—যাহার চক্ষু দিয়া এক বিন্দুও অশ্রু না পতিত হইয়াছে—যাহার হৃদয় একটুও না গলিত হইয়াছে। হৃদয়ের উপর যাহার এতটা অধিপত্য, তাহাতে যে সুফল ফলিবেই তাহা নিশ্চিত।

বাঙ্গালার রঙ্গালয় দ্বারা আর একটী মহান কার্য্য সাধিত হইয়াছে—যাহা অতি অল্প লোকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। সমগ্র বঙ্গদেশে জাতীয় ভাব উদ্দীপনে রঙ্গালয় যে সহায়তা প্রদান করিয়াছে তাহা বাস্তবিকই আশ্চর্য্যজনক। বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া সমগ্র বঙ্গবাসীর হৃদয়ে স্বদেশপ্রীতির যে প্রবল ভাবস্রোত খরবেগে প্রবাহিত হইতেছে, তাহার এত শীঘ্র বিস্তারের কারণ রঙ্গালয়। কংগ্রেস, কনফারেন্স, বক্তাগণের ওজস্বিনী বক্তৃতা জনকয়েকের হৃদয়ে একটা অস্পষ্ট ভাব জাগ্রত করিয়া দিয়াছিল সত্য কিন্তু রঙ্গালয়ই বঙ্গীয় জন সাধারণকে মাতৃভূমির দুঃখতমসাবৃত মলিন বদনখানি চিনাইয়া দিয়াছে। রঙ্গালয়ই বঙ্গবাসীর হৃদয়ে স্বদেশ ভক্তি দৃঢ় করিয়া দিয়াছে।

ষ্টার রঙ্গমঞ্চে "প্রতাপাদিত্য" অভিনয়ে প্রথমে জনসাধারণ মাতৃভূমিকে মা বলিয়া চিনিল—স্বদেশকে পূজা করিতে শিখিল। তাহার

পর একে একে স্বদেশপ্রীতিসূচক অনেকগুলি নাটক রচিত ও অভিনীত হইয়া আমাদের হৃদয়ে সেই ভক্তি, সেই ভালবাসা আরও বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছে। রঙ্গালয় এই কার্য্যে অগ্রসর না হইলে এত সহজে এত অল্প দিনের মধ্যে এই জাতীয় ভাব এত বিস্তৃতি লাভ করিতে পারিত না।

বাঙ্গলা বহুদিন আপনাকে হারাইয়াছিল। বাঙ্গালী আপনার অতীত ইতিহাস, আপনার পুরাতন জাতীয় গৌরব ভুলিয়া গিয়া পরের দ্বারে গৌরবের জন্য, সম্মানের জন্য, মাথা ঠুকিতেছিল, রঙ্গালয় সে হারাণো মাণিক আবার বাঙ্গালীর ঘরে ফিরাইয়া আনিয়াছে। কবিবর রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গলার কবিগণকে সম্বোধন করিয়া আক্ষেপে লিখিয়াছিলেন "তোমরা কতকগুলি মনুষ্যত্বের আদর্শ সৃজন করিয়া দাও, বাঙ্গালীদের মানুষ হইতে শিখাও।" বাঙ্গালার নাটককারগণ সে অভাব পূর্ণ করিয়াছেন। কতকগুলি নিত্যস্মরণীয় আদর্শ চরিত্র তাঁহারা সৃজন করিয়াছেন—রঙ্গালয় সেই আদর্শ চরিত্রে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার সজীব মূর্ত্তি বাঙ্গালীর মুগ্ধ নেত্রের সম্মুখে ধরিয়াছে। সেই সব আদর্শ চরিত্রের ছায়া বাঙ্গালীর হৃদয়ে প্রতিফলিত হইতেছে। বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন গঠনে এই সহায়তার জন্য বঙ্গবাসী রঙ্গালয়ের নিকট চিরকৃতজ্ঞ। ঈশ্বর করুন, বাঙ্গালার রঙ্গালয় আরও উন্নত হউক আরও পরিপুষ্টি লাভ করুক, তাহাতে বাঙ্গালীজাতির উন্নতি—সমগ্র বাঙ্গালা দেশের উন্নতি।

বীরভক্ত গিরিশচন্দ্র।

(রায় সাহেব শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত লিখিত।)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের কৃপাপ্রাপ্ত চিহ্নিত সন্তান বীরভক্ত গিরিশচন্দ্র অন্তিমে ইষ্টদেবতার চরণে লীন হইলেন ;—ইহলোকে রাজার ন্যায় সম্মানলাভের অধিকারী হইয়া পরলোকে সেই রাজরাজেশ্বর ব্রহ্মাণ্ড-স্বামীর শ্রীপাদপদ্ম বক্ষে ধারণ করিলেন ; এ সৌভাগ্য ও সুকৃতী স্মরণেও পুণ্য আছে। তাঁহার বিয়োগ-বেদনায় ব্যথিত ও মর্ম্মাহত হইয়াছি বটে, পরন্তু তাঁহার ভাগ্য ও তাঁহার প্রতি ভগবানের কৃপা স্মরণ করিয়া, এ বেদনায়ও সান্ত্বনা পাইতেছি। আপনাকে পূর্ণরূপে 'পতিত' জানিয়া, যিনি পতিতপাবন জগদ্‌গুরু রামকৃষ্ণদেবকে জীবনের ধ্রুবতারা করিয়াছিলেন,—আমরণ অনন্ত-বিশ্বাসে সেই নররূপী নারায়ণকে অন্তরের অন্তরে পূজা করিয়াছিলেন,—তাঁহার আত্মা যে অতি উর্দ্ধগতি প্রাপ্ত হইয়াছে এবং তিনি যে চিরশান্তি লাভ করিয়া স্মিতমুখে আমাদিগকে নিরীক্ষণ করিতেছেন. তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ করি না। তিনি বড় দম্ভ করিয়া বলিতেন,—"আর আমি জন্মগ্রহণ করিব না, গুরুই আমার জন্ম-জ্বালার হাত এড়াইয়া দিবেন"। এমন গভীর বিশ্বাস. ইষ্টচরণে এরূপ অবিচলিত নির্ভর, আর দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তাই তিনি মনের সাধে ইহলোকের ভোগসাধন করিতে করিতে, পরলোকের পাথেয় আহরণ করিয়া গিয়াছেন। গুরু-কৃপাই তাঁহার একমাত্র সম্বল, সেই ভরসায় তিনি লৌকিকতা বা সামাজিকতা বড় একটা গ্রাহ্য করিতেন না,—মনে যে সখ বা সাধ উঠিত, মনের সাধে তাহা মিটাইয়া লইতেন। বলিতেন,—"বাসনার ক্ষয় না হইলে ত মুক্তি নাই, তবে সাধ্যসত্বে মনের ছোটবড় বাসনাগুলা না মিটাই

কেন? নহিলে আবার আসিতে হইবে, আবার ভুগিতে হইবে;—কিন্তু ছাই-পাশ কিসের আশায়, কোন্ প্রলোভনে সে গতায়াত-কষ্ট ভোগ করিব?" সুতরাং গিরিশচন্দ্রের ধাতই স্বতন্ত্র; সাধারণ ভক্ত বা সংসারাবদ্ধ জীবের সহিত তাঁহার ঠিক খাপ খাইবে না;—তিনি আলাহিদা থাকের লোক; সেই লোকেশ্বরই তাঁহার একমাত্র পারের কর্ত্তা;—জীবনে-মরণে তুল্যরূপে তিনি এ বিশ্বাস হৃদয়ে পোষণ করিয়া ত্রিতাপ জ্বালার হাত এড়াইয়াছেন; সূক্ষ্ম মতবাদের গণ্ডী কাটিয়া আজ আমরা অকপটে ও নিঃশঙ্কচিত্তে তাঁহার অমর আত্মার পূজা করি। যোগ ও ভোগ তাঁহার জীবনে দুই-ই ছিল; সেই যোগীশ্বর সচ্চিদানন্দ গুরুই তাঁহার কর্ম্মাকর্ম্মের বিচার করিবেন; আমরা আজ তাঁহার প্রত্যক্ষ অনুভূতিপূর্ণ স্বর্গীয় বিশ্বাস ও ইষ্টচরণে সম্পূর্ণ আত্ম-সমর্পণের কথা স্মরণ করিয়া কথঞ্চিৎ আত্মপ্রসাদ লাভ করি।

গিরিশচন্দ্র, জীবনে দুইটি বিষয় জানিতেন;—থিয়েটার ও শ্রীরামকৃষ্ণ-দেব। থিয়েটার আমরণ সঙ্গের সাথী করিয়াছিলেন; আর শ্রীরামকৃষ্ণ দেবকে একমাত্র পারের-কাণ্ডারী স্থির-সিদ্ধান্ত করিয়া সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বেগ ছিলেন। জীবনে যতই ঝড়-ঝঞ্ঝাবাত আসুক, যত বাধা-বিঘ্ন আপদ-বিপদ ঘটুক,—"ঈশ্বর মঙ্গলময়,—সকলই তিনি মঙ্গলের জন্য করিতেছেন"—এ বিশ্বাস তাঁহার হাড়ে হাড়ে মজ্জায় মজ্জায় প্রবিষ্ট হইয়াছিল। তাই তিনি কিছুতেই টলিতেন না, কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ করিতেন না, কিছুতেই সঙ্কল্পচ্যুত হইতেন না,—স্তুতি-নিন্দা, সুখ-দুঃখ, লাভ-লোকসান সমানে উপভোগ করিতে চেষ্টা পাইতেন। এই অটল পুরুষোচিত গাম্ভীর্য্যে ও অবিচলিত ধৈর্য্যে, দৈব তাঁহার সহায় হইয়াছিলেন;—স্বয়ং ভক্তের ভগবান্ তাঁহাকে কোল দিয়াছিলেন। প্রকৃত পুরুষকার ইহারই নাম। দাম্ভিকতা পুরুষকার নহে। ঈশ্বরে সম্পূর্ণ নির্ভর—প্রকৃত পুরুষকার; লাফালাফি ঝাঁপা-

ব্যাপি পুরুষকার নহে। 'রাম নাম লইয়া মরিতে হয় মরিব, তবু কাপড় তুলিয়া বাঁচিতেও চাহিনা'—ইষ্টচরণে এই আত্মসমর্পণ ও জ্বলন্ত বিশ্বাসই শ্রেষ্ঠ পুরুষকার। অহং-বুদ্ধির প্রসার ও হামবড়াই পুরুষকার নহে। যাঁহারা মুখে উহা মানিতে না চান, কিংবা কাজেও উহা স্বীকার করিতে নারাজ, "Free will" বলিয়া আত্ম-প্রাধান্য-স্থাপনে সদাই সমুৎসুক, তাঁহারা সেই পথেই থাকুন; কিন্তু মনে রাখিবেন, তাঁহাদের পশ্চাতে অলক্ষিত ভাবে আর একটা অদৃশ্য-শক্তি কার্য্য করিতেছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব শ্রীমুখে বলিতেন,—"এই স্বাধীন-ইচ্ছা-বোধও মায়ের ইচ্ছা"। নহিলে তাঁহার মায়ার সংসার মানাইবে কেন? সৃষ্টির কার্য্য চলিবে কিসে?—সংসারে পাপের স্রোত তা নইলে যে আরও বৃদ্ধি হয়? চোর-চোর খেলায় সকলেই যদি বুড়ি ছুঁইয়া ফেলে, ত খেলা জমিবে কিরূপে? ভক্ত গিরিশচন্দ্র কিন্তু, জীবনে-মরণে তুল্যরূপে বিশ্বাস করিয়া গিয়াছেন,—"আমি কিছু নহি, কর্ম্মী নহি, কর্ত্তা নহি,—সেই জগৎ-কর্ত্তার হাতে যন্ত্রপুত্তলি মাত্র; আমার আবার Free will কোথায়?" ঠাকুরের ভাষায় বলিতে হইলে বলিব,—"আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী; আমি ঘর, তুমি ঘরণী; আমি রথ, তুমি রথী; যেমন চালাও, তেমনি চলি; যেমন বলাও, তেমনি বলি"।

বলা বাহুল্য, এই দৈব-বিশ্বাস,—মনের এই বদ্ধমূল সংস্কার,—একদিনে গিরিশচন্দ্রের হয় নাই,—এক জন্মেও হয় নাই,—ঠাকুরের কৃপায়, ঠাকুরের চরণে আত্ম সমর্পণের ফলে, ধীরে ধীরে তাহা তাঁহার ইহ জীবনে অধিকার করিয়াছিল। তাই তিনি বলিতেন,—"দেখ ভগবানের দান কিছুই ব্যর্থ নয়, আমার অলসতা ও নিশ্চেষ্টতাই আমার ঈশ্বর-নির্ভরতা আনিয়া দিল"। বাল্যে ও যৌবনে কুসংসর্গ ও কুপ্রবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল ছিল, ঈশ্বর বিশ্বাস ত করিতেনই না,—ঐ পথের পথিককেও

ভণ্ড ও ভ্রান্ত বলিয়া মনে করিতেন উচ্ছৃঙ্খলতা ও ভোগ লালসায় দিগ্বিদিক জ্ঞান হারাইতেন; অন্তরে বাহিরে দুর্দ্দান্ত হইয়া সদা বেড়াইতেন। যেন ডাকাত পড়া ভাব,—ধর্ মার্ কাট্। চৈতন্যলীলায় যে জগাইমাধাইয়ের ছবি গিরিশচন্দ্র আঁকিয়াছেন, তাহার একটী যেন স্বয়ং তিনি। ভয় যেন একেবারে গুলিয়া খাইয়াছেন। এমত অবস্থায়ও কিন্তু তিনি সত্য অনুসন্ধিৎসু ও সরল ছিলেন। আপনাকে বুঝিতেন,—আপনার অবস্থা জানিতেন,—নিজেকে পতিত ও অপরাধী বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। ভাবের ঘরে চুরি তাঁহার কখনও ছিলনা।—"পতিত যদি, তবে পতিতপাবনও ত একজন আছেন?" কিন্তু তিনি কে? কিরূপে পাওয়া যায়?"—এই চিন্তার সহিত গিরিশের অন্তর্দাহ ও পিপাসা আসিল। অন্তরে ঘাত-প্রতিঘাত চলিল। পরে শুনিলেন, গুরু নহিলে পারের আশা নাই। কিন্তু এ গুরু পাওয়া যায় কোথায়? সাধারণ মানুষের নিকট তিনি মস্তক অবনত করিবেন? এমন পাত্রই তিনি নন। মনে হইল, কঠিন রোগে পড়িয়া লোকে তারকনাথের নিকট ধরা দেয়। ভাবিলেন, 'আমারও ত এ কঠিন রোগ! একবার তারকনাথকে ডাকিলে ভাল হয় না?' ডাকিলেন, সাময়িক শান্তি মিলিল, কিন্তু আবার অন্তর্দাহ;—প্রাণ যায় যায়। একটী ভক্ত-বন্ধু বলিলেন,—"গুরু নহিলে তোমার পরিত্রাণ নাই"। মনে মনে তারকনাথকে ডাকিলেন,—"বাবা, তুমি যদি সত্য হও, গুরুরূপে স্বয়ং আমায় দেখা দিয়া, তুমিই আমার প্রাণ রক্ষা কর। শুনিয়াছি, নরবেশ ধরিয়া স্বয়ং দেবদেব মহাদেব কোন কোন ভাগ্যবানকে মন্ত্র দিয়া থাকেন; কিন্তু হায়! আমার সে ভাগ্য হইবে কি?" আন্তরিক ব্যাকুলতায় গিরিশচন্দ্র তারকনাথকে ডাকিলেন; গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া কাঁদিলেন; ভগবানের আসন টলিল, স্বয়ং শিবগুরু যোগীশ্বর—পরমহংসবেশী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণরূপে

তাঁহাকে কৃপা করিলেন। তাঁহার অন্তরের সকল সংশয়, সকল সন্দেহ ভঞ্জন হইল। তাঁহার দুর্জ্জয় অভিমান, ঘোর দাম্ভিকতা ধীরে ধীরে বিদূরিত হইতে লাগিল। যেন সহস্র বৎসর-আবদ্ধ অন্ধকার গৃহে কে দীপ জ্বালিয়া দিল। তাঁহার দাবদগ্ধ প্রাণ জুড়াইল। যেন আগুন ভরা এঞ্জিনে কে সমুদ্রের জল ঢালিয়া দিল। ঠাকুরের পুণ্যস্পর্শে, তাঁহার অপূর্ব্ব কথামৃত-পানে, তিনি ক্রমেই নূতন মানুষ হইলেন।

কিন্তু সংস্কার একেবারে যায় না ;—আবার অবিশ্বাস আসিল, আবার সন্দেহ জন্মিল। গুরুকে তিনি পরীক্ষা করিলেন। একদিন পানোন্মত্ত হইয়া, থিয়েটার-গৃহে বসিয়া, সেই অহেতুক কৃপাসিন্ধুকে তিনি অবাচ্য কুবাচ্য করিয়া গালি পাড়িলেন। সে গালি শুনিলে, মরা মানুষও বুঝি জাগিয়া উঠে ; কিন্তু কৃপাময় কাঙ্গাল-ঠাকুর তাহাতে একটুও বিচলিত হইলেন না। যথাসময়ে তিনি ভক্তবৃন্দকে গিরিশের এ কথা বলিলেন। শুনিয়া সকলেই অত্যন্ত ব্যথিত ও মর্ম্মাহত হইলেন। কেহ কেহ এমন্‌ও অনুযোগ করিলেন,—"আপনার যেমন আর সঙ্গ করিবার জায়গা ছিল না, তাই সেই পাষণ্ডটার কাছে গিয়াছিলেন।"—শ্রী দক্ষিণেশ্বরে বসিয়া রামকৃষ্ণদেব একে একে উপস্থিত ভক্তদের মনের এ ভাব লক্ষ্য করিলেন। এমন সময় ভক্ত-চূড়ামণি—রামকৃষ্ণগত-প্রাণ স্বর্গীয় ডাক্তার রামচন্দ্র দত্ত মহোদয় তথায় উপস্থিত হইলেন। রাম বাবুকেও, ঠাকুর গিরিশের ব্যবহার জানাইলেন। কিন্তু ভক্তির অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত রাম,—গুরুকে সাক্ষাৎ নররূপী ভগবান্ জ্ঞানে যিনি পূজা করেন,—সেই পূর্ণ বিশ্বাসী রাম,—যেন কিছু অভিমানের স্বরে—স্পষ্ট কণ্ঠে কহিলেন,—"তা আর কি হইয়াছে বলুন? গিরিশের অপরাধ কি?—সে ঠিকই করিয়াছে।" ঠাকুর যেন কিছু চমকিত হইয়া বলিলেন,—"এঁ্যা! রাম, তুমি এমন কথা বলিলে? গিরিশ ঠিকই করিয়াছে। দেখ্‌লে গো তোমরা?

রামের উত্তরটা শুন্‌লে?" "তা নয়ত কি বলুন? তার যা আছে, সে তাই ত দিবে? কালীয়-নাগকে শ্রীকৃষ্ণ একবার ভৎর্সনা করিয়াছিলেন,—'তুই জীবকে দংশন করিয়া বিষ ঢালিস্‌ কেন?' উত্তরে কালীয় বলিয়াছিল, 'প্রভু, তুমি আমাকে যা দিয়াছ, আমিও ত তাই-ই দিব? তুমি আমাকে বিষ দিয়াছ, আমি অমৃত পাইব কোথায়?" উত্তর শুনিয়া সকলেই চমৎকৃত হইলেন। এমনই একটা উত্তর শুনিতে, বুঝি সেই লীলাময়ের সাধ হইয়াছিল; তাই তিনি উপস্থিত সকলকে লইয়া একটু খেলাইলেন। আর সেই সঙ্গে তাঁর সেই আদি ভক্ত—রামের মানও প্রকারান্তরে বাড়াইলেন। রাম বলিতে লাগিলেন,—"আপনি গিয়াছেন থিয়েটারের গিরিশ ঘোষের কাছে; সে কি আর ফুল চন্দন দিয়ে আপনাকে পূজা করিবে? তার যাহা ছিল, তাহাই দিয়াছে।" উত্তর শুনিয়া কৃপাসিন্ধু নররূপী নারায়ণের মুখকমল যেন আরও ফুটিয়া উঠিল; বড় অপরূপ শোভা হইল;—পতিতউদ্ধারে কৃতসংকল্প হইয়া পতিত-পাবন তখনই গিরিশের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। সঙ্গে রাম প্রমুখ ভক্তমণ্ডলী রহিলেন।

এদিকে গিরিশ,—তাঁহার সে রাত্রিকালের মত্ততা তখন ঘুচিয়াছে,—নেশার ঘোর কাটিয়াছে,—আপনার অবিমৃষ্যকারিতা স্মরণ করিয়া অনুতাপে তিনি ছট্‌ফট করিতেছেন;—এমন সময় দক্ষিণেশ্বর হইতে গাড়ী আসিয়া তাঁহার বাটীর সম্মুখে—গলির মুখে দাঁড়াইল। উন্মুক্ত গবাক্ষপথ দিয়া গিরিশ এ দৃশ্য দেখিলেন। পরমহংসদেবকে দেখিবা-মাত্র, তাঁহার আত্মাপুরুষ যেন উড়িয়া গেল। প্রাণ দুরু দুরু করিয়া কাঁপিতে লাগিল। মরমে মরমে শেল বিদ্ধ হইল। তন্মুহুর্ত্তে একবার তাঁহার মনে হইয়াছিল,—"এ মুখ উঁহাকে আর দেখাইব না,—এই বারাণ্ডা হইতে লাফাইয়া পড়িয়া আত্মহত্যা করি!" কিন্তু অহেতুক

কৃপাসিন্ধু কাঙ্গালের ঠাকুর,—অন্তর্য্যামী নারায়ণ—পতিতপাবন গুরু, ভক্ত-সন্তানের অপরাধ গ্রহণ করেন না,—গিরিশের কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই,—সেই দয়াময়, তাঁহার সেই ভুবনভুলান শ্রীমূর্ত্তির সেই স্বভাবসিদ্ধ স্বর্গীয় শান্তভাব লইয়া স্মিতমুখে তাঁহার সম্মুখে গিয়া বসিলেন,—আর কত আদরে ও সোহাগে তাঁহার গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন। স্নেহময় পিতা যেমন অশান্ত দুরন্ত পুত্রকে মধুর ব্যবহারে মুগ্ধ করেন,—ততোধিক নিঃস্বার্থ স্নেহে ও মধুরতম ব্যবহারে, করুণার অবতার নরদেব শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, ভাগ্যবান্ গিরিশচন্দ্রকে চিরজন্মের মত মোহিত ও মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। সেই দিনের সেই শুভ মুহূর্ত্ত হইতেই গিরিশের মনে ধ্রুব বিশ্বাস জন্মিল,—"ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব কখনই মানুষ নন,—নিশ্চয়ই ভগবান্,—নরদেহে প্রচ্ছন্নলীলা করিতে আসিয়াছেন। কলির জীব আত্ম-অপরাধে সদাই ভীত ও সন্ত্রস্ত ;—তাই দয়াল ঠাকুর এবার সকল বিভূতি লুকাইয়া, নিরক্ষর দীন ব্রাহ্মণের বেশে, পতিত-উদ্ধারের জন্য জীবের দ্বারে দ্বারে ঘুরিতেছেন। এই ত বাবা-তারকনাথ আমার সম্মুখে ; সাক্ষাৎ শিব ত আমি এই চর্ম্ম-চক্ষে দেখিতেছি ! নহিলে এত করুণা, এত ক্ষমা ! স্তুতি-নিন্দা সমজ্ঞান !"—"পতিতপাবন, দীননাথ ! আজ হইতে আমার সকল ভার তোমার উপর। তুমি রাখ,—মার,—আর কিছু বলিব না ;—কেবল তোমার শ্রীপাদপদ্ম স্মরণে অধিকার দিও।" "সত্যই তুমি আমায় ব-কলমা দিলে ? তবে—তাই"। হাসি-হাসি মুখে ভক্তগণসহ ঠাকুর উঠিলেন। গিরিশ কাষ্ঠ-দণ্ডবৎ আবার তাঁহার পাদমূলে পতিত হইলেন।

চক্ষের উপর এ দৃশ্য হইয়া গিয়াছে। যাঁহারা ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যেও বোধ হয় দুই একজন এখনো জীবিত আছেন। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জগাই-মাধাই উদ্ধার প্রকারান্তরে কি ইহারই নাম নহে ? ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দেবকে এই জন্যই তাঁহার

ভক্তগণ,—দ্বিতীয় শ্রীচৈতন্যদেব জ্ঞানে পূজা করেন। উভয়েরই মূলমন্ত্র এক,—জীবে দয়া, নামে রুচি, ভক্তি ভগবানে।—ভাগ্যবান্ গিরিশ কৃপাসিদ্ধ;—সাধন ভজনে সিদ্ধ নন,—অহেতুক কৃপাসিন্ধুর কৃপায় কৃপাসিদ্ধ;—এই ঘটনাতেই তাহার প্রকাশ।

গিরিশের মূলমন্ত্র ছিল বিশ্বাস। এই বিশ্বাস এত গভীরভাবে তাঁহার হৃদয়ের উপর আধিপত্য করিয়া গিয়াছে যে, তাহা আনুপূর্ব্বিক পর্য্যালোচনা করিলে অবাক হইতে হয়। শোকের পর শোক, বিপদের পর বিপদ, এক এক করিয়া কত পারিবারিক দুর্যোগ ও অশান্তি তাঁহার জীবনের উপর দিয়া গিয়াছে;—তথাপি তিনি অবিচলিত। ঠাকুর এক এক করিয়া তাঁহার সকল বন্ধন খসাইলেন,—এক এক করিয়া তাঁহার সকল স্নেহের ধন কাড়িয়া লইলেন, সংসার শ্মশান-স্বরূপ করিয়া ফেলিলেন,—ভক্ত ভগবদ্বাক্যে অচল, অটল। কেন না, তিনি যে একবার সেই পতিতপাবনের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন! তাঁহাকে পারের কাণ্ডারী জানিয়া জীবনের সকল ঝঁকি মুক্তকণ্ঠে তাঁহাকে একে একে জানাইয়াছেন! সেই ভক্তের ভগবান্‌ও যে তাঁর ভক্তিবিশ্বাস ও অকপট আত্মসমর্পণে প্রসন্ন হইয়া, তাঁহাকে বরাভয় দিয়া সংসার-রঙ্গালয়ে ছাড়িয়া দিয়া গিয়াছেন! গিরিশ আমরণ কাল আপনাকে পতিত জানিয়া হাড়ে হাড়ে সেই বিশ্বাস হৃদয়ে পোষণ করিয়াছিলেন; তাই প্রধানতঃ পতিত নরনারীর শিক্ষার ভার, সেই পতিতপাবন তাঁহার চিহ্নিতবিশিষ্ট সন্তানের হস্তেই সমর্পণ করিয়া গিয়াছিলেন। যোগ্য ব্যক্তি যোগ্যভারই পাইয়াছিল। তাই গিরিশচন্দ্রের সহিত বঙ্গীয় রঙ্গালয়ের চিরদিনের সম্বন্ধ। বলিবে, "কামিনী কাঞ্চন-বিজয়ী আদর্শত্যাগী যিনি, তিনি গিরিশকে দিয়া এমন কাজ করাইলেন কেন?" করাইলেন কেন,—তিনিই জানেন। তবে এ কথা ঠিক যে, ভগবান্ বলিয়াই তিনি ইহা পারিয়াছিলেন,—

তোমার আমার মত মানুষ হইলে কখনই পারিতেন না। কাঁটা দিয়াই কাঁটা তুলিতে হয়,—ফুল দিয়া তাহা সাজে না। স্থূলদর্শী সামাজিকের চক্ষে গিরিশ এক হিসাবে কাঁটা ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই কাঁটার আর এক অংশে যে সুবাসিত শ্বেত শতদল ফুটিয়া লুকাইয়া ছিল, তাহা দেব ভোগেই উৎসৃষ্ট হইয়াছে,—ভক্ত ও ভাবুক-গণ সে স্বর্গীয় সৌরভে মোহিত হইয়াছেন;—কূপ-মণ্ডূক সামাজিক শুধু কাঁটাই দেখিয়াছেন;—আসল পদ্মের সৌরভ ও গৌরব উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। পারিলে গিরিশকে পূজা করিতেন, তাঁহার শত অপরাধ মার্জ্জনা করিতেন, বাঙ্গালীর গৌরব-জ্ঞানে তাঁহাকে বহু উচ্চ আসনে সংস্থাপিত করিতেন। কিন্তু রুচিবাগীশ সভ্য সামাজিকগণ তাহা কেহ বড় একটা করেন নাই; পতিতা-সংসৃষ্ট, থিয়েটার ব্যবসায়ী, নটজীবনধারী ভাবিয়া, মনে মনে তাঁহাকে ঘৃণা ও অবজ্ঞা করিয়া আসিয়াছেন। গিরিশচন্দ্র তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিলেও অভিমানের স্বাভাবিক তিক্ততা যে মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে স্পর্শ না করিত, এমন নহে। একস্থানে তিনি বড় আক্ষেপে লিখিয়াছেন,—"সভ্যসমাজে আমার স্থান নাই।" এ কথার অর্থ কি? কবি কি প্রকারান্তরে পল্লবগ্রাহী বঙ্গবাসীর অকৃতজ্ঞতা ও হীন অনুকরণপ্রিয়তার প্রতি কটাক্ষ করিতেছেন না? বলিতেছেন না কি,—"নট বলিয়া তোমরা আমাকে ঘৃণা বা অবজ্ঞা করিতেছ কর; কিন্তু মনে রাখিও, তোমাদের এই ঝুটা সভ্যতায়,—সত্যস্বরূপ যিনি,—তাঁর চক্ষে ধূলি দিতে পারিবে না। আমি নট হই, তোমাদের চক্ষে হেয় ঘৃণ্য বা কুক্রিয়াসক্ত হই,—আমি ভণ্ড নই—ভাবের ঘরে আমার চুরি নাই,—আমার পাবের কর্ত্তা স্বয়ং নটনাথ,—শিবরূপা সেই ভগবান পরমহংস দেব"। প্রকৃতই এমনি একটা উচ্চ অবলম্বন ও আশ্রয় পাইয়াছেন বলিয়া, সাধারণ মানুষকে তিনি আপন সীমানার বাহিরে মনে

করিতেন,জীবনের একমাত্র আদর্শ করিয়াছিলেন,—সেই লোকেশ্বর,—পারের কর্ত্তা—ত্রিগুণাতীত পুরুষোত্তমকে। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, আমি যাহাই করি না কেন,—সচ্চিদানন্দ গুরুই আমাকে ত্রাণ করিবেন।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য।)

অভিনেতা ও অভিনেত্রীর কর্ত্তব্য।

(শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত।)

সেক্সপীয়র বলিয়াছেন,—"All the world's a stage and every man and woman are players."—অর্থাৎ এই বিশ্বসংসারই নাট্যশালা এবং প্রত্যেক নরনারীই অভিনেতা।

কবির উক্তি এক্ষেত্রে পরিহার করিয়া—বিশ্ব রঙ্গমঞ্চ এবং বিশ্ববাসী অভিনেতা অভিনেত্রীদের কথা ছাড়িয়া দিয়া,—আমরা আমাদের আলোচ্য নাট্যশালায় অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

পণ্ডিতবর সিসিরো বলিয়াছেন,—পাঠপ্রণালীর মত কথার উত্থান পতন অভ্যাসই অভিনয়। আর সেই অভ্যাসক্রিয়ায় যিনি সিদ্ধিলাভ করেন—তিনিই অভিনেতা। এই অভিনয় বা অভিনয়ের অনুরূপ বিলাস-সংবলিত ছন্দোবদ্ধে গ্রথিত ভাবময় ভাষা হইতেই সকল জাতির সাহিত্য উদ্ভূত হইয়াছে। সর্ব্বজাতির সাহিত্য, রঙ্গমঞ্চ, কাব্য, নাটক ও অভিনয়ের ইতিহাসের আলোচনায় এই কথা স্মরণ করা আবশ্যক হইয়া উঠে।

নাট্যকার, অভিনেতা ও অভিনেত্রীই নাট্যশালার জীবন স্বরূপ।

ইঁহাদেরই কৃতিত্বের উপর নাট্যশালার আদর, উন্নতি, গৌরব ও প্রতিপত্তি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া থাকে। নাট্যকার নাটকে যাহা বর্ণনা করেন, অভিনয়দ্বারা অভিনেতা তাহা জীবন্ত করিয়া তুলেন। নাট্যকার ভাষার তুলিকায় যে ছবি আঁকেন—ভাবার লালিত্যদ্বারা, কাব্য শাস্ত্রীয় অলঙ্কারদ্বারা তাহার যে শোভা সৌন্দর্য্য সম্পাদন করেন, অভিনেতা তাহারই দেহ, তাহারই মন, তাহারই কার্য্য বিধান করিয়া তাহাকে সত্যবৎ প্রত্যক্ষ করাইয়া দেন। নাট্যকার নাটকে যাহা লেখেন, তাহা কেবল বিদ্বান ও রসজ্ঞেরই অধিগম্য হয় আর অভিনেতা অভিনয়ে যাহা দেখান, তাহা মূর্খ-বিদ্বান নির্ব্বিশেষে সর্ব্বসাধারণের সুখগ্রাহ্য হইয়া থাকে। নাট্যকার যাহাকে ভাবে ভাষায় ছন্দে পরিস্কৃত এবং উজ্জ্বল করিয়া চিত্রিত করেন, অভিনেতা তাহাকেই ভাষাগত ভাবরাশির মধ্যদিয়া এমন ভাবে ক্রিয়াশীল করিয়া তুলেন যে, কল্পনার বস্তু প্রকৃতির বাস্তবরাজ্যে আসিয়া দাঁড়ায়। শ্রেষ্ঠ সুপটু অভিনেতা নাট্যকারের চিত্রকে কেবল জীবন্ত, কেবল পরিপূর্ণ, কেবল সত্যবৎ প্রতীয়মান করিয়াই ক্ষান্ত হন না;—অভিনয় কৌশলে তাহাকে বিশেষত্ব দিয়া, মনোহর করিয়া, সৌন্দর্য্যময় করিয়া গড়িয়া তুলেন। ফলতঃ নাট্যকার সংসার-নাট্যশালার দার্শনিক সূত্রকার, আর অভিনেতা তাহার তত্ত্বদর্শী সুদক্ষ ভাষ্যকার।

নাটক মুখস্থ করিয়া আবৃত্তি করিয়া গেলেই অভিনেতা হয় না। কবি হইলেই যেমন নাট্যকার হওয়া যায় না, সুন্দর আবৃত্তি মাত্র করিতে পারিলেই তেমনই অভিনেতা হওয়া যায় না। দেশ-কাল-পাত্র সম্বন্ধে সকল বিষয়ে অভিনেতার অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন; অধিকন্তু সকল শ্রেণীর লোকচরিত্র ও ব্যক্তিগত বিশেষত্ব লক্ষ্য করিবার অভ্যাস অভিনেতার না থাকিলে একেবারেই চলে না, যাঁহার এই সকল বিষয়ে কিছু মাত্র দৃষ্টি নাই, তিনি অভিনয়-বৃত্তির অনুপযুক্ত।

কবিত্বের ন্যায় অভিনয়শক্তি ও বিদ্যাসাপেক্ষ এবং সাধনায় স্ফুরিত হয়। চতুঃপার্শ্বস্থ প্রত্যেক ব্যাপারের প্রতি সর্ব্বদা শকুনির ন্যায় তীক্ষ্ণ ও সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া বিষয় সংগ্রহের চেষ্টা করাই অভিনেতার শ্রেষ্ঠ সাধনা। এই সাধনায় যে অভিনেতা সিদ্ধিলাভ করেন, তাঁহাকে কলা-কৌশল-বিকাশে ঠেকিতে হয় না বা ঠকিতে হয় না। বিভিন্ন প্রকৃতির লোকে বিভিন্ন অবস্থায় পড়িয়া শোক, দুঃখ, হর্ষ, পুলক, রাগ, দ্বেষ, লোভ, প্রতিহিংসা প্রভৃতি ভাব প্রকাশ করিতে কিপ্রকার অঙ্গভঙ্গি করে, কেমন সুরে কথা বলে, তাহা যে অভিনেতা লক্ষ্য করিয়া অভ্যাস করিতে না পারেন, অভিনয়বৃত্তিতে সাফল্য লাভ করিবার প্রয়াস তাঁহার পক্ষে দুরাশা মাত্র। এই অভ্যাস অর্থে কেবল অনুকরণ বুঝিলে, বিড়ম্বনার একশেষ হইবে। অনুকরণ ভাঁড়ামি মাত্র—অভিনয় নহে। যে অভিনেতা ভাবাভিনয়ের স্থলে অপরের ভাবভঙ্গীর ও স্বরভঙ্গীর অনুকরণ করেন, তিনি ভাববিকাশে নিশ্চয়ই অকৃতকার্য্য হন, অধিকন্তু অপরের শরীর ও স্বরগত দোষগুলির পর্য্যন্ত অনুকরণ করিয়া বিদ্রূপের পাত্র হন। অভিনেতার দায়িত্ব দুইদিকে; ভাব বিশুদ্ধ অভিনয়দ্বারা নাট্যকারের চিত্রগুলিকে জীবন্ত করা আর তাহাতে নিজ সাধনলব্ধ কৌশলসংযোগে দর্শকের তৃপ্তিবিধান করা। এজন্য অভিনেতার নিজ চেষ্টা যত্ন ও অঙ্গচালনের সঙ্গে গুরূপদেশ গ্রহণ করাও আবশ্যক। ফলকথা, সুপটু অভিনেতা হইতে হইলে—নাট্যকলায় সফলতা ও যশলাভ করিতে হইলে, গুরূপদেশ, পর্য্যবেক্ষণ, অভিনিবেশ, ধ্যান, ধারণা ও অভ্যাস একান্ত আবশ্যক।

সভ্য জাতির, উন্নত জাতির যত প্রকার জাতীয় আমোদের ব্যবস্থা আছে, তন্মধ্যে নাট্যামোদই আমোদের মধ্য দিয়া জাতিকে আদর্শের দিকে অগ্রসর করাইয়া দেয়। অভিনয়ে যত আনন্দ যত উচ্চ শিক্ষা লাভ হয়, কোন ধুমধামেই ততটা হয় না। আরল সাহেব বলেন,—

গান বাজনা তো যথেষ্ট আছে, আর সকলকার গান বাজনা ভালও লাগে না, কিন্তু সুদক্ষ অভিনেতার অভিনয় কে না শুনিতে চায়!

প্রাচীন আর্য্যেরা দর্শনযুগে উদাত্ত অনুদাত্ত ও স্বরের উচ্চ নিম্ন বা আরোহ অবরোহ ক্রম রহস্য বিশেষভাবে পরিজ্ঞাত ছিলেন; তাঁহাদের সেই অভ্যাস এখনও কতকটা কথকতায় আবদ্ধ আছে। সুকথক স্বাভাবিক ভাব বজায় রাখিবার জন্য সর্ব্বদা অবহিত হইতেন। কথক-গণকে সর্ব্বদা আর্য্য ঋষিগণের নিয়মাধীনে চলিতে হইত। প্রাচীন যুগের ঋষি ও বৈজ্ঞানিকগণ কথকগণের স্বর-সাধন সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিধানগুলি বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন। সর্ব্বদা উচ্চৈঃস্বরে খোলা বাতাসে পাঠ অভ্যাস করা চাই, মাঝামাঝি রকম ব্যায়াম বা ক্রীড়া আবশ্যক। খাওয়ার পর চীৎকার সুরাপান বা উগ্র দ্রব্যাদির আহার বড় দোষের।

পাশ্চাত্য জগতের মনিষিগণ বলেন, অভিনয়কালে মদ্যপান করা একেবারে নিষিদ্ধ। অভিনয় করিতে করিতে অত্যন্ত ক্লান্ত হইলে অথবা তৃষ্ণা আসিলে একগ্লাস ঠাণ্ডা জল আরবীয় গঁদে মিশাইয়া পান করা উচিত। চেঁচাইয়া অভিনয় করিলে শ্রোতৃবর্গের ভাল না লাগিয়া বরং বিরক্তি উৎপাদন করে। ভূমিকার যে সকল কথা বিশেষ দরকারী সারগর্ভ বা উপদেশপূর্ণ সেগুলি হৃদয়ের ভিতর হইতে বাহির করা চাই। স্বর উচ্চ করিয়া যে কথাগুলি বলা হয়, তাহাতে স্থির বিশ্বাস, দৃঢ়তা ও স্পষ্টভাব প্রকাশ পায়। সরলভাবে সুন্দররূপে ভিন্ন ভিন্নরূপে ধীরতা-সহকারে হাত ও মুখের ভঙ্গি না দেখাইলে কোন অভিনয়ই ভাল হয় না। মনের ভাবের সহিত এই ভঙ্গির যোগ থাকিবে; মুখের কথায় নহে, যতগুলি ভাব—ততগুলি ভঙ্গি থাকা চাই। অভিনেতার সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত যে, শ্রোতারা সকলে বুঝিতে চাহিতেছে, শুনিতেছে, জানিতে চেষ্টা করিতেছে, শিখিতেছে ও অনুভব করিতেছে। অভিনয়কালে যে অভিনেতা এগুলি লক্ষ্য রাখিয়া চলেন—তিনিই

সুদক্ষ অভিনেতা বলিয়া আদৃত হন। ডাক্তার স্মিট বলেন,—তিনিই শ্রেষ্ঠ অভিনেতা, যিনি ছাপার অক্ষরের মধ্যে জীবনীশক্তি আনিয়া শ্রোতৃগণকে মুগ্ধ করিতে পারেন।

ক্রহাম সাহেব বলেন,—লম্বা লম্বা 'সলিলকি' বলিবার একটা বাধাবাঁধি নিয়ম থাকা চাই। তাঁহার মতে,—আরম্ভটা খুব মৃদু হইবে, কথাগুলি আস্তে আস্তে স্পষ্ট স্পষ্ট উচ্চারিত হইবে; মুখ দিয়া তুবড়ি ফুটাইতে হইবে; ক্রমে আরো দ্রুত চড়াইয়া যাইতে হইবে। শেষ সীমায় তর্ তর্ বেগে চড়াইয়া আবার নামাইয়া আনিতে হইবে। যে সময় কথাগুলি শ্রোতাদের প্রাণের ভিতর দিয়া মর্ম্মে প্রবেশ করিতেছে জানিবে তখন আত্মসংযম করিয়া লইবে।

বারনেট সাহেব অভিনয় সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে প্রথম মুখের আড় ভাঙ্গিতে হয়। ইহাকে 'মাউথ একসারসাইজ' বলে। প্রথম কঠিন কঠিন কথাগুলির পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ শিখিতে হয়। অভিনেতার উচ্চারণ শিক্ষিত লোকের ন্যায় উত্তম হওয়া চাই। অভিনেতার উক্তি শ্রোতাদের "প্রাণের ভিতর দিয়া মর্ম্মে" পৌছান চাই। প্রত্যেক চিন্তার শেষ হইলেই একটু থামা চাই। স্বাভাবিক স্বরকে বিকৃত করা উচিত নয়। বিশেষ অঙ্গভঙ্গী বা বাক্যভঙ্গীর দ্বারা প্রত্যেক দুঃখ কাহিনী বর্ণনা করিতে হইবে। যখন শীঘ্র শীঘ্র বলিতে হইবে, তখনও উপমাগুলি মিলাইয়া ও বুঝাইয়া বলা চাই। মুখস্ত না থাকিলে অভিনেতাকে অনেক সময় বিব্রত হইতে হয়। মুখস্ত না করিয়া রঙ্গমঞ্চে নামা, আর জুয়ার আড্ডায় প্রবোরা খেলিতে বসা—একই কথা। সুবিধার উপর উভয়কেই নির্ভর করিতে হয়। অভিনয়ের বিষয়টি উত্তমরূপে বুঝা চাই। অভিনয় একটি শ্রেষ্ঠ শিল্প, এ বিষয়ে রীতিমত অভ্যাস চাই। কোন স্থানে কিরূপ দ্রুত (রেটে) বলা হইবে, কোথায় বিরাম (পজ)

আবশ্যক, কোথায় জোর (এম্‌ফাসিস্‌) দিতে হয়, কোথায় স্বর পরিবর্ত্তন আবশ্যক, কিরূপ অঙ্গভঙ্গি দরকার,—এই গুলিতে অভিনেতা ও অভিনেত্রীর বিশেষ লক্ষ্য চাই।

নির্দ্দিষ্ট গৃহে অভিনেতার অভিনয়-অভ্যাস বিশেষ আবশ্যক। গৃহটিতে যেন সর্ব্বদা বায়ু চলাচল করে ও একটি জানালা সর্ব্বদা যেন খোলা থাকে। অভিনেতাকে অনেক সময় অধিকক্ষণ দম রাখিতে হয়। এ কার্য্য সাধনা সাপেক্ষ। এই জন্য সাধনা-কক্ষে অভিনেতার নাক দিয়া নিশ্বাস লইয়া গলার নিম্নভাগ বায়ুপূর্ণ রাখিতে চেষ্টা করা উচিত। মুখ ও কণ্ঠের চালনা আবশ্যক হইলে নিশ্বাস ৪০ সেকেণ্ড পর্য্যন্ত বন্ধ রাখা চাই ও ৩০ সেকেণ্ড পর্য্যন্ত এক দমে কথা কওয়া উচিত।* অভিনয়ের সময় সোজাভাবে দাঁড়ান একান্ত আবশ্যক।

অভিনেতার অনেক গুণ থাকা চাই। অভিনেতাকে অতি উচ্চ ভাবের শিক্ষায় শিক্ষিত হইতে হয়। অনেক প্রতিবাক্য, অনেকরূপ ভাবার্থ, সাময়িক সাহিত্যের ইতিবৃত্ত অভিনেতার জানা চাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশের অভিনেতাগণের মধ্যে আমরা শিক্ষার অল্পতা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়া থাকি। অনেক অভিনেতাকে সে জন্য পাখীর হরিনাম-শিক্ষার ন্যায় শিক্ষকের ভঙ্গীময় আবৃত্তির অভ্যাস ভিন্ন আর কিছু করিতে দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রত্যেক অভিনেতার সাহিত্যচর্চ্চা বিশেষভাবে আবশ্যক। কিন্তু আমাদের দেশে স্বনামখ্যাত যে দুই চারিজন অভিনেতা আছেন, সেই কয়জন ব্যতীত এ দেশের অভিনেতৃ সম্প্রদায় প্রায়ই সাহিত্যচর্চ্চায় অনবসর। সাধারণ অভিনেতাগণ—নটবৃত্তিই যাঁহাদের একমাত্র উপজীবিকা—আশ্চর্য্যের বিষয় রঙ্গালয়ের বাহিরে নাট্যকলার প্রতিষ্ঠালাভের জন্য

* আমাদের দেশে স্বরোদয়তন্ত্রে এ সম্বন্ধে অনেক বিধান আছে।

অধ্যয়ন, আলোচনা ও সুশিক্ষা গ্রহণে তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণ উদাসীন দেখা যায়। পরনিন্দা পরচর্চ্চা লইয়াই জলবিম্ববৎ যাহাদের দিন কাটিয়া যায়—তাহাদের পক্ষে সাহিত্যচর্চ্চার অবসর কোথায়?

শিক্ষা ও সাহিত্য-চর্চ্চা যেমন অভিনেতৃগণের আবশ্যক, পক্ষান্তরে বিনয়, সরলতা, অমায়িকতা প্রভৃতি গুণরাজি তাঁহাদের অলঙ্কার স্বরূপ হওয়া উচিত। দাম্ভিক, দুর্ম্মুখ, কপট অভিনেতা কখনই নাট্য-জগতে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে না। সৎমনোবৃত্তিগুলি জনপ্রিয় অভিনেতার বিধিদত্ত দান। যিনি উল্লিখিত গুণরাজি বিভূষিত, তিনিই জনপ্রিয় হইয়া থাকেন; এ সৌভাগ্য সকলের অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠে না।

শ্রেষ্ঠ অভিনেতা—যিনি অধ্যয়নের দ্বারা অভিনয়-কলা আয়ত্ত করিয়াছেন, দেশ-বিদেশের নাট্যশালা ও নাট্যকলার ইতিবৃত্ত আলোচনা করিয়াছেন, সাহিত্য-সংসারে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন, যিনি সুবক্তা, সুশিক্ষিত, শাস্ত্রজ্ঞ, জনপ্রিয়, নানা বিষয়ে অভিজ্ঞ, লোকরহস্য-পটু, নাট্যকলাকুশল,—তিনিই নাট্যাচার্য্য হইবার উপযুক্ত পাত্র। নাট্যশালার শিক্ষকতা করিতে যাওয়া বড় সামান্য কথা নহে। শিক্ষকের অনেক গুণ চাই, অনেক শিক্ষা চাই। নতুবা অভিনয়-শিক্ষা দিতে যাওয়া তাহার পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র। স্বর্গীয় নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্রের অসাধারণ অধ্যয়নের কথা নাট্যমন্দিরের পাঠকগণ কে না শুনিয়াছেন? শ্রদ্ধেয় নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় একদিন কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন,—"বই তো ক্রমাগতই কিনিতেছি কিন্তু রাখি কোথায়! রাখিবার স্থান সঙ্কুলান করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। যদি একটা বড় সড় বাড়ী পাই, তাহা হইলে বই রাখিয়া বাঁচি!"—এত অধিক দুষ্প্রাপ্য পুস্তক সংগ্রহ, ও সেই সঙ্গে প্রগাঢ় অধ্যয়ন বোধ হয় বঙ্গদেশে বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

ফলতঃ যাঁহারা নাট্যৈকব্রত, তাঁহাদের নিজেদের বিদ্যাবুদ্ধি অনুসারে অধ্যয়ন, আলোচনা ও গুরূপদেশের অনুবর্ত্তী হইয়া নিজবৃত্তির সাধনা করা একান্ত কর্ত্তব্য। পরনিন্দা পরচর্চ্চায় বৃথা কালক্ষয় না করিয়া তাঁহারা যদি অধ্যয়ন দ্বারা নটবৃত্তির সাধনায় প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে নাট্যশালার এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজের মঙ্গল সাধন করিবেন সন্দেহ নাই। বারান্তরে এ সম্বন্ধে অন্যান্য কথা আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

মেহের-উল্-নিসা।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

(শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায় লিখিত)

বড় বড় দার্শনিকেরা, কবিরা, ঔপন্যাসিকেরা, কল্পনাবাজ লেখকেরা, যুগ-যুগ-ব্যাপী তর্কাতর্কি ও চিন্তার দ্বারা স্থির করিতে পারেন নাই এ জগতে কোনটা সুখ—আর কোনটাই বা দুঃখ।

আকাশে চাঁদ উঠিলে গগনের ভারি শোভা। খালি আকাশ কেন, উজ্জ্বল রজতধারা যখন শ্যামল মেদিনী-বক্ষে, তরঙ্গায়িত নদীবক্ষে পড়িয়া, স্বভাবের সৌন্দর্য্য শতগুণে বৃদ্ধি করে—যে সৌন্দর্য্য স্রোতে ভাসিয়া তরুলতা, পশু পাখী, সবই আনন্দ-স্রোতে মগ্ন—যে চন্দ্রের সুধারাশি পানে, চকোর সুখের পূর্ণমাত্রায় উঠিয়াছে, সকলেই সুখে ভাসিতেছে, প্রেমিক প্রেমিকা, পরস্পর কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া সুখের সাগরে মহাসুখে সন্তরণ করিতেছে; ধরিতে গেলে, সে সময়ে চাতক মহা অসুখী। আকাশে মেঘ নাই দেখিয়া, তাহার সুবিমল মেঘবারি পানের আশা সুদূর-পরাহত ভাবিয়া, সে চন্দ্রদেবকে মনে মনে অভিসম্পাত করিতেছে।

তাই বলিতেছিলাম—যাহাতে এক জনের সুখ, তাহাতে অপরের দুঃখ। এ জগতে কেহবা কাঁদাইয়া সুখ পায়—কেহবা কাঁদিয়া দুঃখ ভোগ করে, কেহবা পীড়ন করিয়া আনন্দ পায়, কেহ বা নিপীড়িত হইয়া কষ্ট ভোগ করে। মৃগয়া-সুখাভিলাষী শবরের জ্যা-নিক্ষিপ্ত সুতীক্ষ্ণ শরে নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তা, অপ্রশস্ত বনপথে অবাধগতিসম্পন্না সুখিনী হরিণীর, কোমল হৃৎপিণ্ড সহসা ছিন্ন হইয়া রক্তধারাময় হয়।

একজনের যাহাতে সুখ, অপরের তাহাতে দুঃখ, কিম্বা একজন যাহাকে সুখ বলিয়া ভাবে, অপরে তাহাকে দুঃখের কারণ বলিয়া ভাবিয়া থাকে।

আমাদের রূপ-গৌরবশালিনী মেহের-উলনিসাও এইরূপ সুখ দুঃখের সমস্যার মধ্যে পড়িয়া, ব্যাকুলচিত্তে কালাতিপাত করিতেছেন। রাজ্যের প্রধান ওমরাহ, আমীর-উল-উমরা গিয়াসবেগের কন্যা তিনি; তাঁহার অভাব কি? পিতামাতার স্নেহ, আত্মীয়-কুটুম্বিনীদের ভালবাসা—আর এক বীর-হৃদয়ের অফুরন্ত অনন্ত প্রেমে, মেহের-মহাসুখী। কিন্তু এত সুখেও তাহার হৃদয়ে মহাদুঃখ।

দুইটী প্রতিকূল স্রোতমুখে পড়িয়া, ক্ষুদ্র তৃণ-খণ্ডের যে দুর্দ্দশা হয়, সে যেমন একবার একদিকে অপর বার অন্যদিকে দ্রুতবেগে আন্দোলিত ও সঞ্চালিত হইতে থাকে, যুবরাজ সেলিমের হৃদয়ের অবস্থাও সেইরূপ। একদিকে অসীম গুণ-মহিমাশালিনী, রূপ-গৌরব-গরবিনী পতি-প্রেমোদ্বেলিত চিত্তা, আজীবন-সঙ্গিনী পাটমহিষী যোধাবাই আর অন্য দিকে নির্জ্জনে প্রস্ফুটিত, সুগন্ধি বন-কুসুমের শোভা-সম্পদময় রূপপ্রভামণ্ডিত মেহের-উল্‌নিসা। যোধাবাই রূপসী বটে, কিন্তু, মেহেরের তুলনায় সে রূপ যেন একটু কম জ্যোতির্ম্ময়। যোধাবাই আজীবন সাধনার জিনিস—দেবীরূপে পূজার জিনিস—আর মেহের উপভোগের জিনিস, প্রজ্বলিত প্রবল আকাঙ্ক্ষায় প্রকৃষ্ট

পূর্ণাহুতি। যে আকাঙ্ক্ষার আগুণ, সুলতানের প্রাণের মধ্যে প্রবলবেগে জ্বলিতেছে সে আগুণ না নিভিলে ত এ জ্বালা থামিবে না।

আবার অন্য পক্ষে মেহের উন্নিসারও এই অবস্থা। সেও প্রেমের বিপরীত পথগামী স্রোত মুখে পড়িয়া হাবু ডুবু খাইতেছে। একদিকে অগাধ স্নেহভরা, প্রেমভরা প্রাণ তাহাকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসা ঢালিয়া দিয়াছে। তাহার প্রতিমাকে হৃদয় সিংহাসনে বসাইয়া, প্রত্যক্ষ দেবী জ্ঞানে পূজা করিতেছে। তাহার দম্ভ নাই, সামাজিক গর্ব্ব নাই, ঐশ্বর্য্য নাই। সে অসিব্রতধারী। এই ব্রতই তাহার জীবনের অবলম্বন। তাহাতেই যাহা কিছু যশ প্রতিষ্ঠা মান-সম্ভ্রম। কিন্তু তাহার নিষ্ঠুর বীর হৃদয়ে কত অফুরন্ত প্রেম! সে যে মেহের ভিন্ন আর কাহাকেও জানে না!

আর মেহের! সেও ত তাহাকে আজীবন দেবতা জ্ঞানে পূজা করিয়া আসিয়াছে। তাহাকে দেখিলে তাহার আনন্দ, তাহার প্রেমভরা সম্বোধনে তাহার উল্লাস, তাহার হৃদয়ের কাণায়-কাণায় ভরা, বিশাল প্রেমের অস্ফুট, অর্দ্ধ অভিব্যক্তিতেও যে তার স্বর্গ সুখ! যার প্রাণে এত মহত্ত্ব, এত ভালবাসা, মেহের এ অবস্থায় তাহায় কি প্রতিদান দিবে?

আর অপর দিকে সসাগরা হিন্দুস্থানের, মহাবলশালী আকবর সাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র সাহজাদা সুলতান সেলিম, সেলিমও তাহাকে ভালবাসে। সে ভালবাসায় গভীরতা কতদূর তাহা সে না জানিতে পারিলেও তাহার মধ্যে যে একটা উন্মত্ততা আছে, তাহার আর কোন সন্দেহই নাই। রূপোন্মত্ত, লঘুচিত্ত, সুলতানের হৃদয়ে আধিপত্য করিতে হইলে রমণী হৃদয়ে যতটা শক্তির প্রয়োজন, মেহেরের তাহা আছে। সে নিজের শক্তিতে বিশ্বাস করিত। যে সের-আফগান অসম সাহসে, জীবন্ত ব্যাঘ্রের সহিত লড়াই করিয়া তাহার মুণ্ড দ্বিধা বিভক্ত

করিয়াছিল, সেই সের-আফগান যখন তাহার ইঙ্গিতে পরিচালিত, তখন দুর্ব্বল হৃদয় সেলিম ত ছার!

মেহের একাকী এক সজ্জিত কক্ষ মধ্যে, এক শোভনীয় দিবানের উপর সুকোমল দেহভার রাখিয়া চিন্তা সমুদ্রের মোহানা খুলিয়া দিয়াছে। এখন দিন রাত সে নিজের সুখ-দুঃখের, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের, চিন্তা লইয়াই বিভোরা।

একদিকে অগাধ ঐশ্বর্য্য—ভবিষ্যৎ সম্রাটের পত্নীত্ব, সসাগরা হিন্দুস্থানের আধিপত্য। নারী-জীবনে যাহা বাঞ্ছনীয়, তাহার সবই হইবে। আর অপর দিকে—দারিদ্র্য, মহাকষ্ট, আজীবনব্যাপী দুঃখ। আলি-কুলিকে পতিত্বে বরণ করিলে, মেহের নিশ্চয়ই সেলিমের কোপে পড়িবে। আকবর-সাহ আর কত দিন! সেলিম, ব্যর্থ মনোরথ হইলে, আলিকুলীর ও তাহার কোন রূপেই পরিত্রাণ থাকিবে না। তাহাকে হিন্দুস্থান ছাড়িয়া আবার সেই জন্মভূমি ইরানের আশ্রয় লইতে হইবে।

মেহের এই গভীর সমস্যাময় চিন্তায় নিমগ্ন। সে বাহ্যজ্ঞান বিরহিতা। এমন সময়ে কে যেন প্রেমমুগ্ধ-কণ্ঠে বাহির হইতে ডাকিল—"মেহের"!

মেহের সে কণ্ঠস্বর চিনিল। সে সব ভুলিল। দিল্লীর রত্নখচিত মসনদের সুখময় স্বপ্ন, সেলিমের প্রেমানুরাগ, তাহার হৃদয়াকাশ হইতে বায়ুতাড়িত শরতের মেঘের ন্যায়—কোথায় চলিয়া গেল। মেহের মনে মনে ভাবিল—সেলিমের চিন্তা করিয়া সে যে মহা পাপ করিয়াছে, সে পাপের প্রবল প্রায়শ্চিত্ত প্রয়োজন। বিদ্যুৎ-গতিতে সে সেই দিবান ত্যাগ করিয়া উঠিল, সেই আগন্তুকের পদদ্বয় ধরিয়া অশ্রুপূর্ণ নেত্রে বলিল—"আসিয়াছ! প্রিয়তম আসিয়াছ! ভালই করিয়াছ। আমি নরকের অগ্নিতে পুড়িতেছি, আমায় বাঁচাও—কান্ত! আর যে